শ্রীসতীমা চন্দ্রিকা

শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র দাস

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রকাশক
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড,
২৫৭-বি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ—১৯৮১

গ্রন্থস্বত্ব : অদ্বৈত চন্দ্র দাস

মুদ্রক
অরুণ কুমার পাইন
আরিন প্রিণ্টার্স
৫১/১/১ সিকদার বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৪

পূজ্যপাদ গুরুদেব

৺বিষ্টুচরণ দাস মহাশয়

স্মরণে

মা আমি অতি মূঢ়মতি দীন হীন জ্ঞান,
না জানি ভজন সাধন ধ্যান, নিজগুণে তারা
কর পরিত্রাণ, অতি সত্য ভবভয়ে কাতর হয়ে,
অবিশ্রান্ত ডাকি তোমারে মা তরাও বলিয়ে,
তব পদ যে করে স্মরণ, কি করিতে পারে
দুরন্ত শমন, আর শমন ভয়ে তুমি রক্ষা
কর জননী, শুভদে মা শুভঙ্করী ত্বং নারায়ণী।

—ভাবের গীত

ভূমিকা

আমার পিতা ৺ভূতনাথ দাস মহাশয়ের সহিত প্রবীন মহাশয়গণ ও ভক্তবৃন্দ কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রতি ভগবৎ মজলিসে, দোল উৎসবের সময় ঘোষপাড়ার-আখড়ায় এবং নিজ বাড়ীতে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আচার, ব্যবহার, ধর্মের রীতি-নীতি, সাধন, ভজন ও ধর্মগত আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হতো এবং তাহা ভাবের গীতের পদগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো।

আলোচনা সভার এক প্রান্তে বসে নীরব শ্রোতা হয়ে তাঁদের আলোচিত বিষয়ের যথার্থ মর্মার্থ অনুভব করার চেষ্টা করতাম।

তাঁদের উপলব্ধি, অনুভূতি ও বিশ্বাসকে ভাবের গীতের ভাবধারার সুনির্মল ও সুস্নিগ্ধ আলোকে সমুজ্জ্বল করে, গীতা, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধকবৃন্দের উক্তির সংযোজনে আরও মধুময় করে এবং আলোচ্য বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করে এই পুস্তকটির রূপদান করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

ঘোষপাড়া সতীমাতা ঠাকুরবাড়ীর ইতিহাসে এই প্রথম প্রকাশিত হল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধন ভজন বিষয়ক বিবরণ।

পুস্তকটির প্রণয়ন কালে বিভিন্ন পুস্তক হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করায় স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ. কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, দীনেশ চন্দ্র সেন, রামদয়াল মজুমদার, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, ক্ষিতি মোহন সেন, পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য্য, কুলদা প্রসাদ মল্লিক, সুনীতি কুমার রায়, পরিতোষ দাস, শশীভূষণ দাসগুপ্ত, প্রমুখ সাধক ও সুধীবৃন্দকে সশ্রদ্ধ প্রণত চিত্তে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ঠাকুরবাড়ীর সেবাইত পূজ্যপাদ ৺সুরেন্দ্র নাথ পাল দেব মহান্ত ও তাঁর ভ্রাতৃজায়া ৺নির্মলা মাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

স্বীকার করি যে এই পুস্তকটির প্রণয়ন কালে আমার মানসিক চিন্তাধারা বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করে সহযোগিতা দান করেছে আমার স্ত্রী শ্রীমতী রমা দাস।

আলোচনার সহায়তাকল্পে যে সকল উক্তি কিংবা শব্দার্থ ভাবধারার অনুবর্তী হয়ে ভাবের গীতের পদের অংশ বিশেষ গ্রহণ করা হয়েছে, তা যদি অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে ভক্তসমাজ ভ্রম সংশোধনে সহায়তা প্রদান করলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

জয় গুরু সত্য

সূচীপত্র

মা তুমি তন্ত্র তুমি মন্ত্র তুমি সারৎসার, তুমি ব্রহ্ম
তুমি গো ধর্ম, ক্ষম জন্ম অনিবার, অনুপমা গুণধামা
গুণের নাই সীমা, অখণ্ড মণ্ডলাকার গো মা তব
নামের মহিমা, ভ্রমেও তোমার নাম যে লয়, তুমি
তারে দাও মা পরম আশ্রয়, সৃষ্টি স্থিতি পালন
কারণ ত্রিগুণধারিণী, লাল শশী কয় ঐ চরণ
বই কিছুই না জানি।

—ভাবের গীত

ঘোষপাড়া



শ্রীশ্রীসতীমাতা

শ্রীসতীমা চন্দ্রিকা

মানুষ লীলা—শ্রীভগবান তাঁর মহিম মূর্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হন না। তিনি অবতীর্ণ হন মানুষ রূপে। মানুষ হয়ে তিনি মানুষ লীলা করেন। ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে এই মানুষের মধ্যে খুঁজতে হবে। এই মানুষ লীলায় বিশ্বাস করতে হবে, তবে পূর্ণজ্ঞান লাভ হবে। তাঁকে জানার অভিলাসী হওয়ার জন্যই তিনি মানুষের মধ্যে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা দান করেছেন।

চণ্ডীদাস বললেন ঃ

গোলোক উপরে মানুস বসতি, তাহার উপরে নাই।
মানুস ভাবেতে বসতি করিলে, তবে সে মানুষ পাই॥

গোলোকের উপর নিত্যধাম। যেখানে সহজ মানুষ বিরাজ করছেন। সেই মানুষ ধামে মানুষ লীলার সহচর ব্যতিত আর কাহারও অধিকার নাই প্রবেশ করার। যাঁরা মানুষের শরণাগত হন, নিয়ত মানুষাচার করেন, কেবল তাঁরাই মানুষ নামের যোগ্য হন। মানুষ লীলার সহচর হন।

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নর বপু তাহার স্বরূপ
গোপ বেশে বেণুকর নব কিশোর নটবর
নর লীলায় হয় অনুরূপ।

সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণ মানুষ রূপে মানুষ মন্ত্র প্রদান করেন। মানুষ রূপে তিনি মানুষাচার শিক্ষা দেন।

মানুষের দেহই হল দেবালয়। তাহাতে যে জীব তিনিই শিব।

মৈত্রেয়ী উপনিষদ বলেছেন ঃ

দেহোদেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ

মানুষের দেহ হল পবিত্র আধার। এই আধারে যে জীব, তিনিই শিব রূপে বিরাজমান হয়ে রয়েছেন। তাঁকে জানার সাধনা হল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনা।

জৈন গ্রন্থ পাহুড় দোহাতে (৯০, ১৮০, ১৮৬) বলা হয়েছে ঃ

"বাহ্য দেবালয় মিথ্যা, সাড়ে তিন হাত এই দেহ
দেবালয়েই সন্ত নিরঞ্জনের বাস। যদি তাঁহাকে
চাও, নির্মল হইয়া সেখানেই কর সন্ধান।
সন্তদিগের অধিষ্ঠান যে দেহ, হায়, সেই আপন
দেহের মধ্যেই তাঁহাকে করিলে না সন্ধান।
শিব স্বরূপ বিরাজমান তোমার দেহ দেবালয়ে,
আর তুমি কিনা খোঁজ কর তাঁহাকে বাহিরে
দেবালয়ে। মনে আসে হাসি, হায়, হায়, ভিতরের
সিদ্ধ পুরুষকে তুমি বানাইলে ভিখারী।"

সাধক রামানন্দের একটি গাথা শিখদের গ্রন্থ সাহেবে স্থান লাভ করেছে। "আমি আর যাবো কোথায় ? সঙ্গীত ও মহোৎসব তো আমার বাড়ীতেই চলছে। হৃদয় আর চলতে চায় না। চিত্ত-বিহঙ্গের পক্ষ স্তব্ধ। একদিন পুষ্প চন্দনের অর্ঘ্য সাজিয়ে বাইরে চলেছিলাম দেবতাকে দিতে। আমার গুরু বুঝিয়ে দিলেন দেবতা আমার হৃদয়ে। তিনি আছেন সর্বত্র, অথচ আমার হৃদয়ে তাঁর অস্তিত্বের সহজ অনুভব।"

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যদি জান্তে পার কোথায় সহজ মানুষ, হয়ে
হুঁস ধরবি আপন জোরে, জীবিত কি আছে
জ্যান্তে মরে, লোকে সেই মানুষকে
খুঁজে বেড়ায় যুগে যুগেতে, গুপ্ত ছিল প্রকাশ
হলো কলির সন্ধিতে।

তিনি এতদিন গুপ্ত হয়ে ছিলেন। কলির সন্ধিতে প্রকাশ হয়েছেন। তাঁকে ধরতে মানুষ ধরে সাধন করতে হবে। মানুষের শরণাগত হয়ে মানুষ ভজন করতে হবে। তবেই সহজ মানুষকে—মনের মানুষকে ধরা যাবে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দেখলাম এই মানুষেতে মানুষ মিশিয়েছে,
বৃন্দাবনে বাকী ছিল ঘোষপাড়ায় পূর্ণ হল,
জীবের দশা মলিন দেখে সতীমা প্রেমের বন্তা খুলেছে।

ভক্ত সাধারণ মলিন রসে সমাচ্ছন্ন হয়ে ক্রমে ক্রমে দীন হীন ভাবে রয়েছে। তাদের দীনতা, হীনতা অপসারণ করে উজ্জ্বল প্রেম রসের আস্বাদন করানর জন্য সতীমা প্রেমের বন্তা খুলেছেন ঘোষপাড়ায়। যিনি প্রেম রসের আস্বাদন করেছেন তিনিই রসিক হয়েছেন। তিনিই মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রেমময়ের দর্শন লাভে জীবন সার্থক করেছেন।

বৃন্দাবনে তিনি মানুষ রূপে লীলা করেছেন। তাঁর সঙ্গী ছিল অষ্ট সহচরী। তাঁদের সহিত উজ্জ্বল প্রেম রসের আস্বাদন করে উজ্জ্বল প্রেমের আদর্শ স্থাপন করেছেন। কলিতে তিনি মানুষের মধ্যে গুপ্ত হয়ে লীলা করছেন। বৃন্দাবনে মানুষ লীলা সীমাবদ্ধ ছিল। সকলকে সাথী করেন নাই। ঘোষপাড়ায় পূর্ণতা লাভ করে। ঘোষপাড়ায় তিনি মানুষরূপে মানুষের মধ্যে লীলা করছেন।

বাঁকাচাঁদ একটি পদে বললেন ঃ

কত দেবতাগণে সাধন করে মানব রূপ
করিয়ে ধারণ, এই ভবে এসে মানুষ বেশে
মানুষের করতেছে সাধন, ধন্য কলি মানুষ ধন্য,
কলিতে মানুষ অবতার, পাইয়া মানব দেহ,
এ মানুষ চিনলি নাকো, ভেবে দেখ মানুষ বিনে
গতি নাইকো আর।

সহজ মানুষের সাধনা করতে দেবতারাও মানুষ বেশ ধারণ করেন। সাধনা করেন এই পৃথিবীর মাটির উপর। এই পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যেই পরম

দয়াময় সহজ মানুষ রূপে বিরাজ করছেন। মানুষ ধরে সহজ সাধনা করলে তাঁর ঠিকানা পাওয়া যায়।

পবিত্র মানব দেহ ধারণ করে তাঁকে চেনার অভিলাসী না হলে মানব জনম হয় ব্যর্থ। বৃথা হয় এই পৃথিবীতে মানুষ বেশে আসা। অন্যথায় মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত বিকৃত মানুষ রূপেই এই পৃথিবীতে অবস্থান করতে হয়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গৌর রায়,
কোন কোন ভাগ্যবান লোকে দেখিবারে পায়।

সত্যধর্ম—ইসলাম ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের ভক্তগণ দাবী করেন যে নিজ নিজ ধর্মমতই হল সত্য, আর অন্য ধর্মমত হল ভন্ডামী পরিপূর্ণ ও অসত্য। ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভক্তগণ মনে করেন সকল ধর্মমতই সত্য। তাঁরা অপর ধর্ম প্রবর্তককে নিজেদের ধর্ম প্রবর্তকের মত শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করেন। কোন ধর্মমতকে মিথ্যা কিংবা ভন্ডামী পরিপূর্ণ একথা বলেন না। কারণ তাঁরা যে সত্যেরই উপাসনা করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে সব সত্যময়। মিথ্যার কোন স্থান নাই। সতীমা প্রচার করেছিলেন—"সকল ধর্ম সত্য, সকল আচার সত্য।" এই প্রকার উদার বাণী একমাত্র সতীমা ছাড়া আর কেহ প্রচার করেন নাই। এই বাণীর প্রভাবে ভক্তগণ অপর ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করেন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

আছে কর্তাভজা এক মজা সত্য উপাসনা, বেদ
বিধিতে নাইকো তার ঠিকানা, এ সব চতুরের কারখানা।

কর্তাভজা সম্প্রদায় হল সত্য স্বরূপের উপাসক সম্প্রদায়। এই সত্য উপাসনা বেদের বিধানে পাওয়া যাবে না। পরমেশ্বর সুকৌশলে সত্য সাধনের বিধান প্রবর্তন করেছেন। সত্য স্বরূপ মানুষের মধ্যে বিরাজ করছেন। একমাত্র মানুষই দিতে পারেন সত্য স্বরূপের উপলব্ধি করার বিধান।

এই মানুষের মধ্যে সত্য স্বরূপ বিরাজ করছেন। এই মানুষের মধ্যে গঙ্গা যমুনা, সরস্বতী, নদ, নদী। ইহার মধ্যে সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত পাতাল, ইহার মধ্যে নয় লক্ষ্য তারা, ইহার মধ্যে কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, ইহারই মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য বিরাজ করছেন। দেহের মধ্যেই ব্রহ্মান্ড। দেহের মধ্যেই তাঁর সন্ধান করতে হবে। বাইরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মুন্ডক উপনিষদ্ বললেন ঃ

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

এই প্রাণ স্বরূপই সর্বভূতে প্রকাশমান। ইহা যিনি জানেন তিনি ধর্মের কথা বলিতে গিয়া কোথাও সত্যের সীমা লঙ্ঘন করেন না।

এই সত্য কেবল সত্য সাধনার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়। এই সত্য উপলব্ধি করেছেন ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায় ও অপর সহজিয়া সম্প্রদায়। এইজন্য সত্য সাধনাই ইঁহাদের একমাত্র সাধনা। সত্য সাধনাই হল মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করার সাধনা।

মুন্ডক উপনিষদ্ বললেন ঃ

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।
এই আত্মা শুধু সত্য তপস্যার দ্বারাই লভ্য।

অথর্ববেদ বললেন ঃ

মানুষের মধ্যেই মৃত্যু ও অমৃত, তার শিরায় শিরায় স্পন্দিত হচ্ছে সব সমুদ্রের উচ্ছাস। শ্রদ্ধা, তপস্যা, সাধনা সবই এই মানুষের মধ্যে, ঋক, সাম, যজু, সবই এই মানুষের মধ্যে, ভূত ভবিষৎ সর্বকাল ও সর্বলোক, সবই এই মানুষের মধ্যে, ব্রহ্ম ও মানুষের মধ্যে। মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্মকে দেখল সেই তাঁকে ঠিক জায়গাটিতে সংস্থিত দেখল।

ছান্দোগ্য বললেন ঃ

এই সবই ব্রহ্ম।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বললেন ঃ

এই আত্মাই ব্রহ্ম।

তাহলে দাঁড়াল এই আত্মাই বিশ্বচরাচর ও ব্রহ্ম।

সংহিতা বললেন ঃ

যে পুরুষে ব্রহ্মবিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠনম্

যাঁহারা মানুষের মধ্যে পরমেশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন, তাঁহারাই পরম স্থানস্থিত ব্রহ্মকে পাইয়াছেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বললেন ঃ

যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ
তস্মাৎ সত্যং বদন্তং আহু ধর্মং বদতি ইতি
ধর্মং বা বদন্তং সত্য বদতি ইতি।

যাহা ধর্ম তাহাই সত্য, যাহা সত্য তাহাই ধর্ম, তাই সত্য বলিলে ধর্ম বলা হয় এবং ধর্ম বলিলে সত্য বলা হয়।

মানুষের হৃদয়েই সত্যেশ্বর বিরাজ করেন এজন্য মানুষের হৃদয়কেই বলা হয় দেবালয়।

সত্য কথা বলা এবং সত্য আচরণ করাই হল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের পবিত্র পালনীয়। তাঁরা ভুল করেও কখন সত্যের অপলাপ করেন না।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যারা প্রাণ থাকিতে কোন মতে মিথ্যা কবে না,
এ সহরে তারা ফিরে আসতে পাবে না।

নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সত্য পালন করার ব্রত। সত্যই কলি যুগের তপস্যা। সত্যই হলেন ভগবান। সত্যাশ্রয়ী হলে তারা আর এই মর জগতে ফিরে আসবেন না। সতীমার বাণী হল সকল ধর্ম সত্য, সকল আচার সত্য। এই বাণী ভক্তবৃন্দ পরম শ্রদ্ধার সহিত জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন।

সাধক শ্রেষ্ঠ রজ্জবজী (১৫৫০ খৃঃ) বললেন ঃ

সব সাঁচ মিলে সো সাঁচ হৈ
না মিলে সো ঝুঠ।

জন্ রজ্জব সাচী কহী
ভাবৈ রিঝি ভাবৈ রূঠ।

সব সত্যের সঙ্গে যার মিল তাকেই বলি সত্য, তা নইলে যে ঝুটা। চাই রুষ্ট হও কি তুষ্ট হও, দাস রজ্জব এই সত্য গেলেন বলে।

হস্তী কেমন জন কয়েক অন্ধ তা বুঝতে চাইল। তাদের দেখা মানে ছোঁয়া। যে ছুঁলে কান সে বললে—হাতী কুলোর মত। দাঁত ছুঁয়ে কেউ বললে—হাতী দড়ির মত, পা ছুঁয়ে কেউ বললে—হাতী স্তম্ভের মত। তারা কেউ ভুল বলেনি। এই উপলব্ধি করে তারা যখন পরস্পরে কোলাহল করতেছে, এবং প্রত্যেকেই নিজস্ব উপলব্ধিকে সত্য বলতেছে, সেই সময় একজন বিজ্ঞ এসে বললেন—তোমাদের প্রত্যেকেরই উপলব্ধি সত্য। উহা একত্র করেই হাতীর চেহারা অনুমান কর।

সেইরূপ যদি কেহ সংকির্ণতা ত্যাগ করে এবং পক্ষপাত শূন্য হয়ে দেখতে পারে তবে দেখা যাবে যে খৃস্ট ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি এই সমস্ত সত্য ধর্মেরই অঙ্গ স্বরূপ। পূর্ণটি দেখা নাই বলেই বিরোধ। পূর্ণটি না দেখা পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরের সহিত বিরোধ করিবেই। নিজের ধর্মকেই মহান বলে অপর ধর্মের উপর পীড়ন করবে। ধর্মান্তকরণ করবে। তাতেও তাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে না। একটা অভাব সর্বদাই অনুভব করবে। অভাবটাই হল পূর্ণটি না দেখতে পাওয়া পর্য্যন্ত। পূর্ণটি অনুভব করলেই সব বিবাদ বিসম্বাদ ঘুচে যাবে। মনে শান্তি বিরাজ করবে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

এই সহজ বসতি সে তো সাগরের মাঝে, তাহার
কাণ্ডারী এক জাহাজে সে পার করে লোক বুঝে,
সে কালালোক দেখিলে বলে ভাই কি চাও,
ফলাফল সেই কূলে পাইবে চলে যাও,
অনায়াসে মনে করে সুখ, এ দেশের লোকাচারে
তেঁই তো সে বৈমুখ।

যাদের সত্যে নিষ্ঠা নাই তাদেরই কালালোক বলছেন। কালালোকের স্থান

সহজ দেশে নয়। তাদের স্থান এই মর জগতে। এই দেশের লোকাচারে তা কখনই সম্ভব নয় সহজ দেশে যাওয়ার, যেখানে সত্য সুন্দর বিরাজ করছেন।

কর্তাভজা সম্প্রদায় পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণ কখনও অংশের নিন্দা করতে পারে না। এজন্য অপর ধর্ম সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। নিন্দা করেন না। তাঁদের ধর্মীয় রীতি নীতি সত্য বলে অনুভব করেন। সত্য ও কল্যাণ পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর্তাভজা সম্প্রদায়ে যে সত্যই দেবতা, সত্যই ধ্যেয়, সত্যই তপস্যা সত্যই হল সাধনা। সত্যকে পাওয়া মানে ভগবানকে পাওয়া, তাতে ও সত্যে কোন ভেদ নাই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বললেন ঃ

সত্যং বৈ তৎ। সত্য ও তিনি অভিন্ন।

মধ্য যুগের নিরক্ষর সাধক কবীর ও বললেন ঃ—সত্যের সমান তপস্যা নাই, মিথ্যাই হল সেরা পাপ। যাঁর হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত, তাঁর হৃদয়ে তিনি স্বয়ং বিরাজমান।

ভক্ত সাধক দাদু (১৫৪৪ খৃঃ) বললেন ঃ—সত্যই হল সরল ও শুদ্ধ পথ। যে হয় সাচ্চা, সেই যায় সেই পথে। সেখানে ঝুঠার চলবার যো নাই।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন

দেখ কি জন্যে হে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন,
কেন বা এ জীবন ধারণ, তা ভাব না কখন,
দেখ জীবদ্দশায় ফলাফল সাধ্য কি সাধন,
কখন বা তার কিছু করলে আহরণ, বুঝলে
যদি কার্য্য কিছুই নাই, মিথ্যা আর
আনাগোনা করছো কেন ভাই, আর শশী
বলে আসল ভুলিয়ে বসে রয়েছ।

আসল ভুলে রয়েছে। আসলই হল সত্য। তারা সত্য মনে করে মিথ্যাতেই নিয়ত রয়েছে। মিথ্যার বশবর্তী হয়ে তারা বারবার জন্ম মৃত্যু বরণ করছে। দিশেহারা হয়ে যাতায়াত করছে। লালশশী স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আসল অর্থাৎ সত্য ভুলে রয়েছো বলে এই যাতায়াত। আসল বস্তুর অন্বেষণ কর।

লালশশী ভাবের গীতে আর একটি পদে বললেন ঃ

ভাই অভিমানে ভর করে বস্তু হারিও না,
আসল বস্তু না চিনে রে ভাই মজাতে মজো না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বললেন ঃ

হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি
হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্

হৃদয়ের দ্বারাই সত্য জানা যায়, কারণ মানুষের হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত।

হৃদয়স্থিত সত্য সুন্দরকে জানার জন্যই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনা। এজন্য এ সম্প্রদায়ী ধর্মকে "সত্য ধর্ম" বলা হয়ে থাকে।

নানক কহিছে সার সেই সত্য সারাৎসার
আর সব প্রলাপবচন
যত কিছু অন্য বোল সব শুধু গণ্ডগোল
কর ভাই সত্যের সাধন।

(পদের অংশ বিশেষ)

কর্তাভজন—আর্য্য ঋষিগণ কঠোর সাধনার দ্বারা ধ্যান যোগে সূক্ষ্ম শক্তি ও পরমেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। এই সকল সূক্ষ্ম শক্তিই হল হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কতকগুলি সৃজনাত্মিকা, কতকগুলি পালনাত্মিকা ও কতকগুলি সংহারাত্মিকা শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব একই পরমেশ্বরের তিনটি গুণ বিভাগ মাত্র।

ঘোষপাড়া ঠাকুরবাড়ীর ভক্তগণ পরমেশ্বরের সাধনা করে থাকেন বলে ঘোষপাড়ার ভক্ত সম্প্রদায়কে "কর্তাভজা সম্প্রদায়" বলা হয়। কর্তাভজা সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠান। ইহাদের সাধন পদ্ধতি ও আচার বিধি গতানুগতিক ধারায় অনুসৃত না হয়ে নিজস্ব ধর্ম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় বলে প্রচলিত ধর্মাচরণ হতে সামান্য বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। এজন্য ভক্ত জন সাধারণের মধ্যে অনেকেই কর্তাভজা সম্প্রদায়কে নীতি বহির্ভূত

ও আদর্শহীন সম্প্রদায় বলে মনে করেন কিন্তু তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

স্বয়ং কর্তা এসে মুলুকে করলে বীজ রোপন
কার বা সাধ্য লয় করে থাকেন আমার এই কর্তারই ভজন।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হলেন আউলচাঁদ। তিনি বাইশজন শিষ্যকে বীজমন্ত্র প্রদান করেন। তাঁকেই স্বয়ং কর্তা বলে সত্যদর্শী লালশশী পদে উল্লেখ করেছেন। এই কর্তা ভজন কখনও অবলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং ইহা রোধ করাও কারও পক্ষে সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

লালশশী ভাবের গীতে আর একটি পদে বললেন ঃ

আছের অনাদি সে আপনি এসেছে, কাঙ্গাল
দেখে সেই গুণমণি আপনি কাঙ্গাল হয়েছে,
স্বরূপ নামটি যেচে বিলাচ্ছে, যোগীগণ
বহু কষ্টেতে, জানতে পারে না যারে ধ্যানে
জ্ঞানেতে, এখন সেই হরি এই জীবের ভাগ্যে
আপনি সদয় হয়েছেন।

গরীব কাঙ্গালকে উদ্ধার করার জন্য দীনদয়াল আপনি সদয় হয়ে কাঙ্গাল বেশে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি নিজেই সদয় হয়ে স্বরূপ নামটি বিলাতে এসেছেন।

পরমেশ্বরকে নয়নে দেখা যায় না। দেখা শুনা না হলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করা যায় না, সম্ভবও হয় না। এজন্য এ সম্প্রদায়ে পরমেশ্বরকে আলেকলতা বলে অভিহিত করেছেন। অলক্ষ্য হতে আলেকলতা কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। শ্রীগুরুকে পরমেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করে তাঁর আশ্রয়ে ভক্তবৃন্দ সাধন ভজন করেন। শ্রীগুরুর কৃপায় একদিন ভক্তের নয়নে অন্তরের আলেকলতা রূপী পরমেশ্বর মূর্তমান হয়ে উঠেন।

পরমেশ্বর এক কিন্তু তাঁর ভাবধারা বিভিন্ন ভাবে প্রকটিত হয়েছে। ভক্তগণও এক একটি ভাবের অনুবর্তী হয়ে তাহা সাধন ভজন করেন। বাংলাদেশ

হল বিভিন্ন ধর্ম সাধনার সাধনভূমি। পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি সাধনা করে চলেছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য বৈরী শক্তির আক্রমণে ও তাদের নিজস্ব ধর্ম প্রচারের উন্মাদনায় সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে তথাপি বাংলার পবিত্র মাটিতে আবার সকল ধর্ম সম্প্রদায় নিজস্ব ভাবধারায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। কর্তাভজা সম্প্রদায় হল একটি সাধক সম্প্রদায়। তার নিজস্ব ভাবধারা অনুযায়ী একটি স্থান অধিকার করে নিয়েছে। সাধন মহিমায় উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে বাংলার মাটিতে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে অপর সকল ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি।

কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধন ভজন ইত্যাদি উপলব্ধি করতে হলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির আলোকে তাহা পর্যালোচনা করলে সঠিক অবগত হতে পারা যায় কিন্তু পান্ডীত্যের অহমিকার দর্পণে তাহা প্রতিভাত হয় না।

শ্রীগুরু—ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায় অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্যতম একটি গুরুবাদী সাধক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে গুরুকে অবশ্য 'মহাশয়' বলে অভিহিত করা হয়। শুদ্ধ, সত্ত্ব ও সর্বগুণ সমন্বিত ভক্তকে যেমন অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় 'সদ্‌গুরু' বলেন, এ সম্প্রদায়ে তাঁকেই মহাশয় বলেন। তথাপি বন্ধুজনের সুপরিচিত ও শ্রদ্ধান্বিত গুরু শব্দটি আলোচনা কালে উল্লেখ করা হয়েছে।

যখন ভারতে দেবদেবীর উপাসনা আদৌ প্রচলিত হয় নাই সেই উপনিষদ্‌ কাল হতেই গুরু বা আচার্যের উপাসনা প্রবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। ভারতে গুরু বা আচার্যের উপাসনা অতীব প্রাচীন, সুতরাং মানুষ গুরু বা মহাশয়ের পূজা করে কর্তাভজা সম্প্রদায় কোনও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ করে নাই।

কঠোর সাধনার দ্বারা যখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তার ঐ কামনা শূণ্য শুদ্ধ আধারে জগত্‌ গুরুর যে ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়, তাঁকে গুরু বলে। লীলা বা যুগ প্রয়োজন অনুসারে জগত্‌ গুরুর ইচ্ছা যখন মূর্ত হয়ে উঠে, তখন স্থূলে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখনই তাঁকে অবতার বলা হয়। গুরু মানুষ, অবতারও মানুষ। গুরু হন কাঁরা? যাদের ব্যক্তিত্ব, জীবত্ব, বৈশিষ্ট্য সব

ধ্বংশ হয়ে যায়। নিজের কোন ইচ্ছা থাকে না। জগৎগুরু তাঁকে যন্ত্র স্বরূপ করে কাজ করে থাকেন।

তিনি আদি গুরু। জগতের গুরু প্রণালী পারম্পর্য্য শৃঙ্খলায় তাঁর নিকট হতে বার হয়ে অব্যাহত ভাবেই চলেছে। ঈশ্বরের এই ভাবটি মধুর বা করুণ ভাব। তিনি গুরু রূপে মানুষকে তুলে লওয়ার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। যাঁর স্বরূপ অনন্তজ্ঞান ও অনন্ত প্রেম, তিনি মানুষকে ধর্ম দিয়েছেন। মানুষের ধর্ম-পিপাসা তাঁরই প্রেরণা। ঈশ্বরের সহিত মানুষের যে সমস্ত সম্বন্ধ প্রচারিত হয়েছে, তার মধ্যে ঈশ্বরের গুরু ভাব একটি প্রধান কাজ।

গুরু মূলতঃ জগৎগুরুর স্বরূপ। অবতারের প্রচারিত মত ও পথকে সাধারণের মধ্যে সাধনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গুরুর উদ্যম। গুরুর স্বরূপত্ব উপলব্ধি করে—

লালশশী ভাবের গীতে বললেন :

সার কর মন গুরু করুণাসিন্ধু চরণ যুগল, যদি
ভবে এসেছ যাতে হইবে জীবন সফল, ত্রাণ হবার
যদি জান কল, মনে কর এ ঘোর পাথার, শ্রীগুরু
বিনে রে ভাই কে করে নিস্তার, আর বলবুদ্ধি
সাধ্যি মাত্র ভেবে দেখ সেই কেবল।

মন যদি বসে না এল ত সব গেল। মনের স্বভাবই হচ্ছে এই যে ভাবৎ ভাব টেনে এনে বিষয়ে নাবিয়ে দেওয়া। ইন্দ্রিয়াদির প্রলোভনে মন দিশেহারা হয়ে পড়ে। ভক্ত চঞ্চল হয়ে উঠে। বিপথে ধাবিত হয়। তাই মনকে অন্য বিষয়ে আসক্ত না হয়ে শ্রীগুরুর চিন্তা করার জন্য প্রেরণা দান করছেন লালশশী। মন গুরুর প্রতি আকৃষ্ট হলে সকল ভ্রম দূরীভূত হবে। মন স্থির হবে। গুরুর প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত হবে। বিশ্বাস এলেই নির্ভরতা আসবে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন :

অন্য বিষয়েতে আছ যতক্ষণ, ক্ষান্ত হয়ে চিন্তা
কর মন ওরে শ্রীগুরুর চরণ, যে পদ স্মরণে রে

ভাই ভ্রান্তি যায়, তারে না ভেবে কিমেতে
বল পার হইবে এই ভবার্ণবে, অকাতরে করুণা
করে, সেই বিনে আর কে আছে ত্রিকূল
সংসারে, তারে ভাবলে প্রফুল্লিত হয় হৃদি পদ্মদল।

মন যাতে বিপথগামী না হয়, সেইজন্য শ্রীগুরুর চিন্তা করতে বলেছেন। কারণ ইষ্ট চিন্তা করার চেয়ে শ্রীগুরুর চিন্তায় ফল বেশী। ইষ্টকে তো চোখে দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীগুরু প্রত্যক্ষ বিদ্যমান রয়েছেন। এজন্য শ্রীগুরুর স্বরূপ চিন্তায় বিভোর হতে বলেছেন। গুরুর আশ্রয় পেলে আর কোন অবস্থাতেই পতিত হবার ভয় থাকে না।

লালশশী ভাবের গীতে বলছেন ঃ

যদি মন সেই গুরুর চরণ একান্ত করতে পার সার,
তবে আর ভবে পারের জন্যে ভাবনা নাই তোমার,
যারে কৃপা করেন তিনি, তুচ্ছ সেই ব্রহ্মপদ
হয় তখনি, গুরু পাদ পদ্মে শশী লালের
সকল ফলাফল।

শ্রীগুরুর পাদ পদ্মে একান্ত ভাবে মন প্রাণ সমর্পণ করলে, সকল ফলাফল তাঁর চরণে অর্পণ করলে, তাঁর কৃপায় শিষ্যের মনের সমস্ত চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়। কামনা বাসনা শান্ত হয়ে আসে। ক্রমে ক্রমে বাহ্যভাব কেটে যায়। শিষ্যের হৃদয়ে ভক্তির কুসুম ফুটে ওঠে। হৃদয় ভগবৎ ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায়। দেহাত্মাভিমান বিনষ্ট হয়। আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। আত্মস্বরূপের পরিচয় লাভ করে। আত্ম সাক্ষাৎকার ঘটে। তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়ে যায়। ভব বন্ধনের অবসান হয়।

যিনি আত্মস্বরূপ লাভ করেছেন তিনিই গুরু। যিনি করেন নাই, তার নিকট গেলে গুরুর অভাব পূর্ণ হয় না। কাঁচা গুরু হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। তাঁদের শিষ্যকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে না।

কর্তাভজা সম্প্রদায় ও অন্যান্য সহজিয়া সম্প্রদায়ে দেবদেবী অপেক্ষা গুরুমূর্তি বিশেষ ভাবে পূজনীয়। একমাত্র গুরুর কৃপায় তাঁরা ভক্তের দৃষ্টি

গোচর হয়ে থাকেন। গুরুর কৃপায় ও উপদেশে ভক্ত শিষ্য সাধনার স্তরগুলি সাধন করার প্রেরণা লাভ করেন। গুরু তাঁকে সব কিছুই দেখিয়ে দেন। পথপ্রদর্শক রূপে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যান। পরে গুরুর প্রসাদে ভক্ত শিষ্য শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করার সাধনায় সফলতা লাভ করেন। এজন্য অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুরূপ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভক্তগণ গুরুকে দেবতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সাধন ভজন করেন। মানুষ গুরুর পূজা করেন।

দেবতার আসনে গুরুকে পূজা করলে, মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কে বড় ? ভগবান না যিনি পথ দেখান তিনি ? সুফী সাধক শাহ লতিফ উত্তর দিলেন "গুরু এবং গোবিন্দ আমার সম্মুখে। আমি কার সঙ্গে যাব ? আমি যাব গুরুর সঙ্গে কারণ তিনিই তো গোবিন্দের সাক্ষাৎ সম্ভব করে দিয়েছেন। আমি বেইমান হতে পারি না"।

সাধক কবীর বললেন—"ভগবান আমাকে এই মায়ার সংসারে জড়িয়ে দিয়েছেন। আমার মুরশিদ আমাকে মুক্ত করেছেন। নমো নমঃ গুরু ! তোমাকে নমস্কার।"

গুরু নানক বললেন ঃ

গুরু কৃপা হবে যবে সন্ধান মিলিবে তবে
কোথা তীর্থ কোথা রত্ন চিনিবে তখন,
গুরু এক নিত্য জ্ঞান অচিন্ত্য অব্যক্ত নাম
সকল জীবের প্রাণ সঙ্কট মোচন
নানক, চিনিয়া লও আপনার জন।

(পদের অংশ বিশেষ)

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

মন গুরু ব্রহ্ম, গুরু বিষ্ণু ভজ হৃদয়েতে, মনের
ভ্রম সকল দূরে যাবে, ভোলামন, শ্রীগুরুর কৃপাতে।

রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ বললেন ঃ

কর সদ্গুরু কি আশ
হোয় ঘট্‌মে প্রকাশ
হোয় তিমির কি নাশ

তিনি বলিতেন—"বাবা ভগবানের নাম সাধনে অনেক ফল হয়, নিষ্ঠাপূর্বক করিতে করিতে অনেক প্রকার সিদ্ধিও লাভ হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির সাধন ইহা দ্বারা হয় না। কেবল সদ্‌গুরুর কৃপাতেই জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে না।"

শিষ্য—অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের সহিত কর্তাভজা সম্প্রদায়ে ভাষাগত কিছু কিছু প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন অন্য সম্প্রদায়ের গুরুর আশ্রিত ও দীক্ষিত ভক্তকে শিষ্য বলে, তেমনি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরুর আশ্রিত ও দীক্ষিত ভক্তকে বলে বরাতি। ভাষাগত প্রভেদ থাকলেও মূলতঃ উভয়ই একই অর্থবোধক। বরাতি বলার উদ্দেশ্য হল ভক্ত গুরুর চরণে জীবনের সব কিছুই সমর্পণ করে থাকেন, বিনিময়ে পরম ধন লাভ করার আকাঙ্ক্ষায়। গুরু ও ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য শিষ্যের সাংসারিক, ব্যবহারিক ও ধার্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ছায়ার মত পাশে থেকে পথের সকল বাধা বিঘ্ন অপসারণ করে দেন। অভীষ্ট পথে অগ্রসর করিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গ আলোচনা কালে বরাতি শব্দটির ব্যবহার না করে শিষ্য শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

বন্ধু ভব সিন্ধু কারাগার, কেমনে হইবো পার,
কি প্রকার এবার আর পাইব নিস্তার, দেখো
সবে এ কি বিষম দায়, হায় কি হইবে উপায়,
কাল গেল না কাল হলো, জঞ্জাল হলো ভাই এ সংসার।

পৃথিবী হল একটা সিন্ধুর সমান। সিন্ধুতে যেমন মানুষ দিশেহারা হয়ে তলিয়ে যায় ও পরিশেষে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তেমনি সিন্ধুর মতই সীমাহীন মায়া, মোহ ও কামে মানুষ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে এই পৃথিবীতে। এর থেকে নিস্তার পাবার উপায় নাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগারের মত মানুষ অনিত্য জিনিষে আসক্ত হয়ে বন্দী হয়ে রয়েছে। আশী লক্ষ বার মানুষ এই কারাগার সদৃশ সংসারে জন্ম ও মৃত্যু বরণ করছে। এ যাতায়াতের বিরাম নাই। কারাগারের আওতার বাইরে বেরিয়ে আসার কোন পথও খুঁজে পায় না।

উপায়ও নাই। ভক্তের চিন্তা এই ভব সিন্ধু কেমন করে পেরিয়ে নিত্যধামে ফিরে যাব।

এই ভব সিন্ধু পেরিয়ে আসার একমাত্র অবলম্বন গুরু। তিনিই পারের রাস্তা দেখিয়ে দেন। ঈশ্বর কারাগারে নিক্ষেপ করেন। গুরু কৃপা করে শিষ্যকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন। শিষ্যের মানব জনম হয় সার্থক।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

গুরু পদ সার, নিত্য অবতার, যাঁর কৃপাবলে ফলের
সঞ্চার, মুক্তি গতি ভক্তি মতি ঐ পদেতে সমর্পণ।

গুরুকেই অবতার সদৃশ জ্ঞান করে শ্রদ্ধা, ভক্তি নিবেদন করেন। নিজের ধর্ম, কর্ম, পাপ, পুণ্য, ভাল, মন্দ সব কিছুই তাঁর চরণে সমর্পণ করেন। তাঁর হুকুমের অপেক্ষায় থাকেন। তাঁকে আশ্রয় করেন। গুরুর হুকুম মত কার্য্য সম্পাদন করে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করেন। গুরুর হুকুম মত কাজ করাটাই গুরু সেবা বলে অন্তরে অনুভব করেন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

শ্রীগুরুর নাম অমৃত সেবন, কররে সব বন্ধুগণ,
বিশেষণ স্মরণ মনন নিরীক্ষণ, তত্ত্ব উপাক্ষণ,
ভক্ত সে ভাজন, জ্ঞান হৃদিপদ্মে সর্বদা ধারণ।

শ্রীগুরুর নামামৃত পান করার ফলে শিষ্যের চিত্ত শুদ্ধি হয়। তখন গুরুই যে জগৎ গুরুর স্বরূপ তাহা অনুভব করেন। গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি রাখলে তাদের কিছুতেই জ্ঞান হবে না।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যে যার শরণাগত হয়,
চাতুরী উচিত তার কদাচিৎ নয়।

সরল ভাবে তাঁর স্মরণ মনন করেন। গুরুর উপাসনায় মনকে সুস্থ রাখতে চেষ্টা করেন। পরিশেষে মনের সব দোষ দূর হয়ে যায়। চাতুরী সাধনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

অগণিত মূর্খ, অজ্ঞ, বিবেক বৈরাগ্য হীন মানুষ ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরুর চরণাশ্রিত হয়। গুরুর কৃপায় তাদের দীনতা, হীনতা, অশুদ্ধতা, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়ে যায়। তারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের আস্বাদনে অভীভূত হয়ে সরল অন্তঃকরণে গুরুর চরণে আত্ম নিবেদন করে। শিষ্যের চিত্ত শান্ত হয়ে আসে। কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তখন শিষ্য অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে গুরুর সমীপে জানতে চায়—

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

শুনতে চাই ইহার বিবরণ, কেন যায় না মনের
ভ্রম, অনিবার করে ভ্রমণ, হয় না নিবারণ,
যদি খুচলো না সংশয়, পুনঃ পুনঃ কি জন্যে
যেতে আসতে হয়, আর কি জন্যেই বা
অনর্থক এ জনম করম।

আত্মজ্ঞানী গুরু শিষ্যের এই আবেদনে সন্তোষ লাভ করেন। তার মনের সংশয় নিরসন করেন। সব দ্বিধা দূর করে দেন।

ভক্তি উৎপাদন করতে গেলে যার মনে হয় আমার অনেক কর্তব্য আছে। স্ত্রী পুত্র, পরিবারের উপর কর্তব্য আছে, হাট-বাজার আছে, লেখা আছে, সভা সমিতি আছে, রোগীর সেবা আছে, প্রবন্ধ লেখা আছে, সংবাদ পত্র পড়া আছে, চাকুরী বজায় রাখা আছে ইত্যাদি অনেক কর্তব্য আছে। এরূপ ব্যক্তি যখন গুরুর সান্নিধ্যে আসে, গুরুর প্রসাদে তার মনে প্রত্যয় হয় এই জগৎ সংসারে সর্বোর মধ্যে পরমপুরুষ বিদ্যমান। বিশ্বাস করে সংসার মালিকের। আমি একজন তাঁর সংসারে গোলাম মাত্র। তখন তার মনের অহং অভিমান দূর হয়ে যায়। মনে প্রশান্তি ফিরে পায়। চিত্ত শুদ্ধ হয়। ভক্তি ভাবে সাধন পথে এগিয়ে যায়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

তুমি সকলকে এক মানুষ বলে কল্লে বর্ণনা
সেই মানুষ এই মানুষে থাকে কিসে ভেঙ্গে
বল না, যদি ছোট বড় মাঝারি সব কল্লে
একাকার, কেবা গুরু কেবা শিষ্য ভজন করি

কার, যদি তুমি আমি খুচিয়ে দিলে তুমি,
তবে কে আমি কার ভজন কে করে,

সকল মানুষের মধ্যে তিনি জীবাত্মা রূপে অবস্থান করছেন। মানুষের মধ্যে ছোট বড় বলে কোন প্রভেদ নাই। তখন শিষ্য করণীয় কার্য সকল নির্লিপ্ত ভাবে যন্ত্রীরূপে করেন। মন তার নিবদ্ধ থাকে গুরুর প্রতি। সর্বদা গুরু মূর্তির অনুধ্যান করেন। এ স্তরে সেব্য ও সেবক ভাব বিদ্যমান থাকে। ইহা দ্বৈত ভাব। গুরুর প্রগাঢ় অনুধ্যান করায় ও ভালবাসার ফলে গুরু মূর্তি শিষ্যের অন্তরে ফুটে উঠে। তখন শিষ্য অন্তরেই তার আরাধ্য গুরু মূর্তি দর্শন করেন। কে কার ভজন করে এইভাবে বিমোহিত হয়ে থাকেন। আমিত্বের পূর্ণ প্রসার ঘটে। গুরু ও শিষ্য এক হয়ে যায়। ইহা হল অদ্বৈত্য ভাব।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

কেউ দুঃখ দেখে পিছিও না বলছি বারে বারে,
যখন যা হয় এ ভব সংসারে থেক সহ্য করে,
ভাই বিধাতা কি সাধেতে কল্লে সুখে দুঃখ,
দুঃখচয় ভয় না কল্লে হয় ত পরম সুখ, শ্রম
সাধ্য বিনে সুখ ইচ্ছে, যেওনা যেওনা ভাই সে
সুখের পিছে, লালশশী ভণে দুঃখ বিনে থাকে
কি জীবের জীবন।

দুঃখে পতিত হলে মানুষ বেসামাল হয়ে পড়ে। হা হুতাশ করে। কিন্তু দুঃখই হল কষ্টি পাথর। দুঃখে যখন পড়ে, তখন সে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সর্বদা মালিককে স্মরণ করে। প্রার্থনা করে দুঃখের অবসান ঘটানর জন্য। দুঃখের ফলে তার মানসিক উৎকর্ষতা সাধিত হয়।

দুঃখের অবসানেও এই মানসিকতা বজায় থাকে। ক্রমশ সে ব্যক্তি ভগবদ্-মুখী হয়। এজন্য দুঃখে কাতর না হবার জন্য সান্ত্বনা দান করছেন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দুঃখ সন্তাপের যদি না হত সৃজন, ভাল থাকতে
এ তিন লোকে কেবা করত বিধাতার স্মরণ, দেখ

না ভাই যত সুখীগণ, দুঃখের বেলা ডেকে মন্ত্রণা,
সুখের সময় হলে কারো আলাপ থাকে না,
দেখ হায় বিধাতা বলেরে ভাই ডাকে নাক সুখীগণ।

সুখীগণ সুখে আকন্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকে। মালিককে স্মরণ করার সময় পায় না। সুখে বিভোর হয়ে আত্মতৃপ্তির জন্য যে কোন অসামাজিক কাজ করতে দ্বিধা বোধ করে না। মালিককে ডাকার প্রয়োজন বোধ করে না। তাদের সুখের মহান্ধতা দূর করার জন্যই এ পৃথিবীতে দুঃখের সৃষ্টি। দুঃখই মানুষকে সজাগ করে দেয়। দুঃখই মালিককে ডাকার প্রেরণা সঞ্চার করে।

শিষ্যের চিত্ত শুদ্ধির জন্য লালশশী ভাবের গীতে অনেক পদ রচনা করেছেন। সেগুলি অনুশীলনের জন্য গুরু সর্বতোভাবে শিষ্যকে উৎসাহিত করেন। ভক্ত শিষ্য ভাবের গীতের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে ব্রতী হয়। ধর্মের বিধি অনুসারে নরহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচার করে না, গুরুজনকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করে, প্রতিবেশীকে ভালবাসে, সরলতা অবলম্বন করে, কায়, মন ও বাক্যে পরপীড়ন করে না, বিষয় সুখ ক্ষণস্থায়ী বলে মনে করে। এই ভাবে তাদের আচার, ব্যবহার ও মন পরিমার্জিত হয়। প্রকৃত ভক্তে পরিণত হয়।

গুরুর প্রভাবে এইভাবে শিষ্যের সাধন, ভজন ও মানসিক উৎকর্ষতা লাভ হওয়ার ফলে সে তখন মর জগতের সীমানা অতিক্রম করে সহজ দেশের যাত্রী হয়। তখন আর শমনের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হতে হয় না।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যখন অন্ধকূপে বদ্ধ হয়ে ছিলাম রে
শমন, তখন তোমার জাঁক ছিল ভারি,
সে জারি খাটবে না এখন, এখন দীক্ষা
হয়ে শিক্ষা নিয়েছি, বাক্য প্রত্যক্ষ্য হলো
কলুষয় রক্ষা পেয়েছি, তোরে ফাঁকি দিয়ে
যাব বেয়ে দেখবি চেয়ে দুরান্ত।

ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট হল যে ভক্তদের কোন তিলক কাটা নাই, রঙ্গিন কাপড় পরা নাই, মালা ব্যবহার করে না, মাথায় জটাজুট থাকে না।

সাধারণ গৃহীর মত জীবন যাপন করে অথচ প্রত্যেক ভক্ত শিষ্যই অভিষ্ট লাভের পথে এগিয়ে চলেছে। পথে ঘাটে তাদের চেনা যাবে না। কেবল আচার, ব্যবহার ও আলাপ আলোচনায় প্রকাশ পাবে তারা একটি বিশিষ্ট সাধক সম্প্রদায়ের ভক্ত শিষ্য।

নাম মাহাত্ম্য—ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ে নাম কীর্তন ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠানে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তারা শ্বাসে শ্বাসে নাম সাধন করে চলেছে। নাম সাধনের বিরাম নাই। নাম কীর্তন করার সুযোগ দান করে লালশশী অসংখ্য পদ ধর্মীয় সাধন প্রণালীর উল্লেখ করে রচনা করেছেন। ঘোষপাড়ার নাম কীর্তন ভক্ত জীবনের সূত্রপাত। শ্বাসে শ্বাসে নাম কীর্তন করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ শ্রীমদ্ভাগবতে বললেন ঃ

অনবরত বিষয় ভোগের বাসনায় ব্যাকুল
হৃদয় জীবগণের পক্ষে হরি গুণানুকীর্তনই
সংসার সমুদ্র উত্তরণের অপূর্ব ভেলা। ইহা
শাস্ত্র, যুক্তি ও মীমাংসার দ্বারা সম্যক অবধারিত হইয়াছে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

নাম রস পানেতে মত্ত হওরে রসনা, চতুর্বর্গ
ফলের অধিক ফলে যদি থাকে তোমার
বাসনা, ভবে আর তবে কিসের ভাবনা, নামে
ধর্ম নাম ব্রহ্মময়, গুণাতীত রসনাতে বশীভূত
হয়, আর সেই নামেতে রসনা হে উসুস্ যেন দিও না।

নাম রস আস্বাদনে রসনাকে মত্ত রাখার জন্য উপদেশ দান করছেন। নাম সাধনের ফলে সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য এই চারটি ফলের উপরের ফল অর্থাৎ কৈবল্য মুক্তি বা নির্বাণ মুক্তি লাভ করা যায়। প্রথম চারটি ফল কর্মজ। নির্বাণ মানে নিবে যাওয়া নয়। তা হল আমিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়ে শ্রীভগবানের পাদ পদ্মে নিজেকে লীন করে রাখা। তিনি

গুণাতীত ব্রহ্ম, নাম ব্রহ্ম, নামই হল ব্রহ্মময়। নাম রস আস্বাদনের ফলে গুণাতীত ব্রহ্ম বশীভূত হন। আর কোন প্রকারে তাঁকে বশীভূত করা যায় না। এজন্য নাম রস সাধনে ক্ষান্ত হয় না। শ্বাসে শ্বাসে নামরস আস্বাদন করে। নামের মধ্যে বিমোহিত হয়ে শ্রীভগবানের স্বরূপ দর্শন করে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

নামামৃত প্রকাশিত রসনা হইতে, শুনিতে শুনিতে
পুনঃ বর্তে রসনাতে, এই নাম গুণ প্রসঙ্গ করিতে
করিতে, কামনার অতীত সঙ্গ বর্তে হে তাহাতে, নাহি
আর নামের সমান, হয় ত রসনা শ্রবনেতে রস
পান, আর শশীলালে হেসে বলে কাজ কি ফলের কামনা।

শ্রীভগবানের পবিত্র সঙ্গ লাভ করার জন্য মুনি ঋষিরা ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছেন। সেই কামনার অতীত সঙ্গ লাভ করা যায় নাম সাধনের দ্বারা। তখন ভগবান আর ভক্ত এক হয়ে যায়। শশীলাল হেসে বলছেন যে সর্বকার্য্যের ফলের মূলাধার, ফলদাতা শ্রীভগবান স্বয়ং যখন নামের মধ্যে অভেদ হয়ে রয়েছেন, নাম ও নামীর মধ্যে আর ভিন্নতা নাই, তখন আর পৃথক ফলের কামনা করে কি লাভ ?

বৈষ্ণব সাধক বললেন ঃ

কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি চিদানন্দময়।
পূর্ণ শুদ্ধ নাম নামী কভু ভিন্ন নয়॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

এজন্য নাম সাধনে ক্ষান্ত হয় না। স্মরণ মনন বিহীন নাম করার অবশ্য কোন ফল লাভ হয় না। একনিষ্ঠ হয়ে শ্রীভগবানে মন সমর্পণ করে অনবরত নাম সাধন করে।

নামের শক্তি অদ্ভুত। নামের ফলে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ভাব ফুটে উঠে। ধর্মবিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা, এসব কিছুই থাকে না। মনে এক অনাবিল আনন্দের উদ্রেক হয়। সমভাব জাগ্রত হয়। তখন ব্রাহ্মণে চণ্ডালে কোলাকুলি করে। নাম সাধনের প্রভাবে কর্তাভজা ভক্তদের মধ্যে জাত

পাত, কুল, মান, শীলের কোন অস্তিত্ব নাই। সকলেই আনন্দ চিত্তে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে, সকলেই সকলের আপন জন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দেখছি কি মজা রে ভাই সাক্ষাতে সাক্ষাতে,
নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আর পারে না সে
থাকিতে. দেখ না ভাই দেখ না সবেতে,
ঠকঠকিতে ঠেকিলে কখন, না ডাকিতে না
ডাকিতে করে মুস্কিলে আসান, সে
রাখিতেছে সবার মান নিমিকে নিমিকেতে।

মানুষ যখন দুঃখ সন্তাপের মধ্যে নিপীড়িত হয়, হা হুতাশ করে, নিস্তার পাবার কোন উপায়ও দৃষ্টি-গোচর হয় না, কারণ দুঃখ সন্তাপের পরিধি সুবিস্তৃত। তখন মানুষ অসহায় হয়ে সর্ব ইন্দ্রিয় ও মন প্রাণ সম্মিলিত ভাবে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করে। চোখের জলে বুক ভেসে যায়। উপায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। আত্মবিস্মৃত হয়ে পরম নিষ্ঠার সহিত নাম স্মরণই সত্যকার নাম স্মরণ। মানুষ এই ভাবে সশ্রদ্ধচিত্তে নাম স্মরণ করে তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করায় শ্রীভগবান চঞ্চল হয়ে উঠেন। অংশ স্বরূপ মানুষের আকুল প্রার্থনায় পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীভগবান করুণায় বিগলিত হয়ে পড়েন। দুঃখ সন্তাপহারী শ্রীমধুসূদন আর স্থির থাকতে পারেন না। কৃপা করে সকল দুঃখ সন্তাপের অবসান করে দেন।

দুঃখ সন্তাপের অবসানের পরে মানুষের মনে সেই সাত্ত্বিকভাব আর স্থায়ী হয় না। ইন্দ্রিয়াদি চঞ্চল হয়ে উঠে। মানুষ আবার আত্ম গরিমায় উন্মত্ত হয়ে উঠে। দাম্ভিকতায় জীবন যাপনে রত হয়। নাম স্মরণের ফলে উদ্ভুত সাত্ত্বিক ভাবও ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে যায়। দয়াময়ও তত দূরে সরে যান।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন :

তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান সেই নামরস আশ্রয়, নামেতে
সকল পূর্ণ জানিহ নিশ্চয়, সকাম নিষ্কাম
অভেদ সে ধাম, কাম শুদ্ধ হয় লইলে সে
নাম, আর শশী হয়ে বশীভূত প্রকাশিত সর্বক্ষণ।

তন্ত্র, মন্ত্র, ধ্যান সবই নাম রস হতে উদ্ভূত। তন্ত্র, মন্ত্র ও ধ্যানের মধ্যেও নাম সাধন করা। সব সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল মধুর নামরস আস্বাদন করা। মলিন কাম ও শুদ্ধতা লাভ করে মধুর নাম স্মরণে। নামরসের প্রভাবে সমস্তই সঞ্জীবিত হয়ে নিত্যধামের পথে অগ্রসরে প্রেরণা দান করে। নামের মহিমায় সকল কামনা বাসনা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবত বললেন ঃ

> জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
> জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্
> স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে
> প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্

জ্ঞান লাভের ইচ্ছা ছেড়ে দিয়ে যাঁরা শরীরে, মনে ও কথায় সদাচারী হয়ে সাধুজনের মুখ থেকে সহজেই তোমার গুণকীর্তন শুনে জীবন ধারণ করেন, তাঁরাই তোমাকেই জয় করেন যদিও ত্রিলোকে কেউ তোমায় জয় করতে পারে না।

এজন্য নাম করতে এত মধুর, বলতে এত মধুর, ভক্তি যোগে মধুর হতে মধুরতম হয়ে উঠে। যতই নাম করা যায়, ততই নাম রস আস্বাদনের প্রতি প্রাণ অধীর হয়ে উঠে। যাঁর নাম এত মধুর, তাঁর প্রেম না জানি কত মধুর। আর নামীর দর্শন যে কত মধুর তা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

স্বল্পায়ু, দুর্বল, অন্নগত প্রাণ, কলিযুগের মানবের পক্ষে কঠোর সাধনা করা কখনও সম্ভবপর নয়। এজন্য নামই হল কলিযুগের সহজ সাধনা। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বেদব্যাস বলেছেন "কলৌ তদ্ধরি কীর্তনাৎ।" কলিতে শ্রীহরির নাম কীর্তন দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়। নামের বলে ভক্তের কাছে ভগবান আবির্ভূত হয়ে তাঁকে কৃতকৃতার্থ করে থাকেন। নাম সাধনে আর একটা বিশেষত্ব যে নাম নিত্য সিদ্ধ, পূর্ণ, শুদ্ধ মন্ত্র। ইহা দীক্ষার অপেক্ষা করে না। অদীক্ষিত ব্যক্তিগণও নাম অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। নাম সাধনায় যাগ, যজ্ঞ ও পুরশ্চরণাদি বিশেষ ক্রিয়াও প্রয়োজন হয় না। অহংকার পরিত্যাগ করতঃ দীনতা অবলম্বনে সমাহিত চিত্তে ও বিশ্বাসের সহিত নাম সাধন করলে ফল লাভ হয়।

ঘোষপাড়া সম্প্রদায়ী ভক্তবৃন্দ উপাস্য দেবী সতীমার স্মরণ ও মনন করে নাম সাধন করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন সতীমা হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপা। তাঁর

করুণা লাভ হলে তাঁরই অঙ্গাঙ্গি রূপে শোভিত পরমপুরুষের করুণা লাভ করা যায়। এজন্য প্রতি নামকীর্তন মজলিসে সতীমার ভাবমূর্তি ছবি কিংবা একটি সুসজ্জিত আসন রাখা হয়। তাঁরই সম্মুখে ভক্তবৃন্দ ভাবের গীত হতে পদাবলী কীর্তন করেন। অপর ধর্ম সম্প্রদায়েও একই রীতি প্রচলিত আছে। নামকীর্তন চলাকালে সতীমার আবির্ভাব ঘটে এ সত্য ভক্তদের হৃদয়ে অনুভূত হয়।

নাম মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভাগবতে বললেন ঃ

নাহংতিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

"হে নারদ, আমি বৈকুন্ঠে থাকি না, যোগিগণের হৃদয়েও থাকি না। আমার ভক্তগণ যেখানে আমার গান করে, সেইখানেই আমি অধিষ্ঠান করি।"

মহাত্মা যীশু খৃষ্ট বললেন ঃ

"Where two or three are gathered
together in my name, am I in the
midst of them." (Bible)

যেখানে দুই বা ততোধিক লোক সমবেত হয়ে আমার নাম করে, সেইখানে তাদের মধ্যে আমি উপস্থিত হই।

শাস্ত্রকার বললেন ঃ

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী সিন্ধুঃ সরস্বতী চ
সর্বতীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ

যেখানে ভগবানের লীলা প্রসঙ্গ কীর্তন হয়, সেখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, সিন্ধু প্রভৃতি সর্বতীর্থের আবির্ভাব হয়ে থাকে।

চৈতন্য চরিতামৃত বললেন ঃ

শ্রীরাম পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন
কণ্ঠে ধরি কহে তারে মধুর বচন।
তোমার গৃহের কীর্তনে আমি নিত্য নাচিব
তুমি দেখা পাবে আর কেহো না দেখিব।

লালণশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যদি গরীব কাঙ্গাল নাম ধরে ডাকে
তখনি হৃদপদ্মে বসে দেখা দেয় তারে।

তন্ত্র বললেন ঃ

জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ ন সংশয়ঃ

সুফী সম্প্রদায়ে হাদীসে আছে—আমার বান্দার যখন ঠোঁট নড়ে, আমি তখন তাঁর সঙ্গে। প্রার্থনার চেয়ে এই নিষ্কাম কর্ম আমার প্রিয়তর।

মনুসংহিতায় উপাংশুজপের মত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের নীরব জপ। সুফীদেরও নীরব জপ, প্রভেদ সুফীরা জপমালা বা তসবীর সাহায্যে জপ করেন। কর্তাভজা ভক্তবৃন্দ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে জপ করেন। মালা ব্যবহার করেন না।

নাম সাধন ও পাপাচরণ—সকল ধর্ম সম্প্রদায়েই নাম সাধনের রীতি প্রচলিত আছে। প্রবর্তক স্তরে নাম সাধনই প্রাথমিক সাধন। নিষ্ঠার সঙ্গে নাম করতে হয়। নাম সাধন প্রধানতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত। তিনটি স্তর হল স্মরণ, মনন ও নিরীক্ষণ। ভাবের গীতে লালশশী বলেছেন—"স্মরণ মনন নিরীক্ষণ করলে সদক্ষণ বর্তে সুখচয়।"

ইষ্টনাম জপ করাই হল স্মরণ। স্মরণই হল ধ্যান। সব পথেই ধ্যানের প্রয়োজন আছে, ধ্যান মানে প্রগাঢ় চিন্তা। যাঁকে যত ভালবাসা যায়, তাঁর কথা চিন্তা করতে, তাঁর রূপ চিন্তা করতে তত ভাল লাগে। তাঁর কথা তত মনে আসে। মনটাকে সর্বদা তাঁর প্রতি স্থির ভাবে রাখা। তাঁকে মানসচক্ষে অবলোকন করাই হল নাম সাধন।

নাম সাধন করতে করতে সত্ত্বগুণের প্রকাশ প্রতিফলিত হয়। আহার ও চিন্তা সাত্ত্বিক করা প্রয়োজন। এইভাবে অগ্রসর হলে বিশ্বাস আসবে। সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, ও গুরুর উপদেশ গ্রহণ, গুরুর উপদেশ পালন। এই সমস্ত অনুসরণ করতে করতে বিশ্বাস আসবে। বিশ্বাস এলেই নির্ভরতা আসবে। এই বিশ্বাসই ভক্তকে অভীষ্ট পথে অগ্রসরের সহায়ক হবে ও তার সাধন সার্থক ও ফলবতী হয়ে উঠবে। নামরূপ ভগবানের গুণগান করাকে কীর্তন বলা হয়ে থাকে।

শাস্ত্রকার বললেন ঃ

সর্বধর্ম বহির্ভূতঃ সর্বপাপরতস্তথা
মুচ্যতে নাত্রসন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনাৎ।

সর্বধর্ম ত্যাগী, সর্বপাপনিরত ব্যক্তিও যদি হরিনাম সংকীর্তন করে, সেও পাপমুক্ত হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

নাম সাধন করা কালে সাধারণের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠে। সকলেই তাকে সাধু বলে ভক্তি নিবেদন করে। স্ত্রী পুরুষ অবাধে তার সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। তার শরণাগত হয়। তার সঙ্গে নাম কীর্তনে অংশ গ্রহণ করে। ভগবানের তত্ত্ব কথা তার নিকটে শুনার প্রত্যাশায় তার সমীপে উপবেশন করে। এই ভাবে অবাধে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ লাভে যদি কোন ভক্ত নামের দোহাই দিয়ে কোন প্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তার সহজে নিস্তার নাই।

নাম্নো বলাদযস্যহি পাপবুদ্ধি
র্নবিদ্যতে তস্য যমৈহিশুদ্ধি

নামের বলে যে পাপাচরণ করে, যমালয়ে কঠোর শাস্তির দ্বারাও তার পাপ স্খালন হয় না।

ঐশ্বর্য্যভাব ও মাধুর্য্যভাব—ঈশ্বর আরাধনা করতে হলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। তিনি ভাবময়। ভাব সাধনায় ভক্তের হৃদয়ে নিষ্ঠা আসে। তাঁর ভাবময় মূর্তি ভক্তের নয়নগোচর হয়। ভক্ত ও ভগবান, উভয়ের সাহিত একাত্মতা স্থাপিত হয়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যাতে প্রবৃত্তি স্থিতি গতি নিবৃত্তি বর্ত্তি যাহাতে,
জেনে তত্ত্ব কোনখানে যুক্ত সে ব্যক্ত রূপেতে,
তার ঐশ্চর্য্য মাধুর্য্য ধার্য্য যে রূপে, হয় যদি
সে অবাধ্য তবু আরাধ্য সাধ্য সেই রূপে।

ভক্তেরা ঈশ্বরকে উপায় বা উপলক্ষ্য বলে তাঁর আরাধনা করেন। তারা প্রধানতঃ একটা ভাবের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। সাধারণতঃ সকলে ঈশ্বরের ঐশ্চর্য্যভাব বা বহিরঙ্গ ভাবের সহিত বেশী পরিচিত। ইহা ছাড়া ঈশ্বরের আর একটা ভাব আছে তা হল মাধুর্য্যভাব।

ঐশ্বর্য্যভাব হল অনন্ত ঐশ্চর্য্য, অনন্ত মহিমা, অনন্ত জ্ঞান, তিনি চিন্তাতীত। ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র হৃদয়ে সেই বিরাটত্ব ভাব অনুভব করা কখনই সম্ভবপর হয় না। সেই কারণেই ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে তাঁর ঐশ্বর্য্য ভাবের উপাসনা করা একে-বারেই অসম্ভব। এজন্য মানুষকে তাঁর মাধুর্য্য ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

ঈশ্বর যে কেবল সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় রূপে, প্রকাশক রূপে আছেন মাত্র তাহা নয়। তিনি যে কেবলমাত্র অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন, লয় নিজের শক্তিতে প্রতি মুহূর্তে সাধন করছেন তাহা নয়। তাঁর মধ্যে এক চিন্ময় আনন্দ আছে। তিনি রসরূপ। তিনি অতীব মধুর। বেদ বলেছেন—"তিনি নিখিল, তিনি মধু" আরও বলেছেন 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধা সর্বানন্দী ভবতি।" তিনি রস স্বরূপ। জগতে এই যে আনন্দের মেলা ও প্রেমের খেলা রয়েছে, এ কেবল তাঁরই সেই চিন্ময় আনন্দের সাহায্যে। ঈশ্বর আনন্দময়, করুণাময়, প্রেমময়, আপনা হতে আপনার জন, এই প্রকারে আপনভাবে তাঁকে লাভ করার উপাসনাই হল মাধুর্য্য ভাব।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

আছে ঐশ্চর্য্য মাধুর্য্যভাব রাজ্যের ভিতরে, চক্ষু
মিলে দেখবি তিলে তিলে দিচ্ছি বলে তোরে।

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দুটি ভাবই রাজ্যের ভিতরে অর্থাৎ মানব দেহের মধ্যেই রয়েছে। এই দুটি ভাব সুন্দর ভাবে বুঝতে পারা যায় নীচের একটি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে।

এক রাজা হাতীতে চড়ে খুব সমারোহে নগর ভ্রমণে বার হয়েছেন। সঙ্গে রথ, অশ্ব, পদাতিক সব সারি সারি চলছে, দৌবারিক আগে আগে লোক সরাচ্ছে। নানা প্রকার বাজনা বাজছে। পথের দুধারে লোক কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যেরা দূর হতে রাজাকে সম্ভ্রমে অভিবাদন করছে। ক্রমে রাজা নগর ভ্রমণ করে রাজ বাড়ীতে ফিরে এলেন।

রাজা রাজসভায় রত্ন সিংহাসনে এসে বসলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি এবং সভাসদ সকলে জোড় হাতে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। বিচার আরম্ভ হল। কেহ এসে বললে মহারাজ! অমুক আমার অনিষ্ট করেছে। সুবিচার করুন। কেহ এসে বললে—মহারাজ! আমাকে কিছু ভূমিদান করুন। রাজা সকলের প্রার্থনা শুনলেন। যাহাকে যাহা দিবার দিলেন। ক্রমে বেলা হল। সভার কাজ শেষ হল।

সভা ভাঙ্গার পর রাজা এবার আহার ও বিশ্রামের জন্য অন্তঃপুরে চললেন। পাথমধ্যে রাজমুকুট খুললেন। তরবারি নামালেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। এখানে আর সে সম্ভ্রমের ব্যস্ততা নাই। রাজা যেন নিয়ম বন্ধন হতে প্রেম ও অনুরাগের সহজ ও সরল রাজ্যে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখানে রাজার রানী আছেন, ছেলে আছে, মেয়ে আছে। ইহারা রাজার কাছে কিছুই চায় না। কেবল রাজাকেই চায়। ছেলে ও মেয়ে খেলা করছিল। তারা খেলা ভেঙ্গে নাচতে নাচতে এসে রাজাকে জাপটিয়ে ধরে। কোলে ওঠে। কোনমতে রাজবেশ ত্যাগ করে রাজা তাদের আব্দার মেটাতে থাকেন। রাণী এসে অভিমান সুরে বললেন—আচ্ছা রাজকার্য্য যা হোক। এত বেলা হয়েছে, খাওয়া দাওয়ার কথা বুঝি মনে নাই।

রাজা যখন নগরের পথে, রাজসভায় ছিলেন তখন রাজার ঐশ্বর্য্যভাব আর অন্তপুরে রাজার মাধুর্য্য ভাব।

এই উদাহরণে প্রতীয়মান হয় যে ভগবানের যে সমস্ত গুণরাজি আছে তা সমস্তই তিনি মানুষকে দান করেছেন। সেই গুণগুলি অবশ্য সুপ্ত ভাবে মানুষের মধ্যে বর্তমান রয়েছে। গুরুর কৃপায় সাধনার প্রভাবে ভগবানের রূপ উপলব্ধি করার সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারা যায়। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাব যখন এক নয়, তখন উভয় ভাবকে সমান জ্ঞান করে সাধন ভজন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

জ্ঞানে ঐক্য না হলে কোন কালে কার
কথা কে মেনেছে, জ্ঞানেতে বুঝায় সাঁচা কি
মিছে, নাটুয়ার নাট, রাজার রাজ্যপাট, না
বুঝে হাটের দরজায় দিতে চাও কপাট, ভাই
মাধুর্য্য ঐশ্চর্য্য সমান জ্ঞান হলে কি প্রাণ বাঁচে।

জ্ঞানে মনে ঐক্য করে ধর্মের আশ্রয়ে যারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁরা ঐহিক সুখ সুবিধা বা মৃত্যুর পরে স্বর্গাদি প্রত্যাশী হয় না। এমন কি মোক্ষের আকাঙ্ক্ষাও তাঁদের নাই। ঈশ্বরের আরাধনা করাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও একমাত্র সফলতা। কেহ কেহ রাজ্যের জন্য, ঐশ্বর্য্যের জন্য, স্বর্গের জন্য, মোক্ষের জন্য, পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য ঈশ্বরের আরাধনা করেন। এই সমস্ত সাধকের কাছে ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র, উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র। মনের অভিলাস অনুসারে একটা ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তাঁকে জানা, তাঁকে পাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য থাকা বিধেয়। ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ ঐহিক সুখ সুবিধার প্রতি আসক্ত হন না। তাঁকে পাওয়ার উপায় স্বরূপ মাধুর্যভাবের সাধনা করেন।

পঞ্চভাব ও সাধনা—লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দেখ ভাব ভক্তি পদার্থ রাগানুগা যা, ভাবীজন
বিহনে কিছু হয় না মজা, ভাব বিনা কে পাবে
ঠিকানা, দেখ ভাই ভাবীর ভাবে অভাব থাকে না,
আর ভাব ছাড়া আপগরজির সাথে কে মিলিতে চায়।

ভাবের গীতে লালশশী রাগানুগা সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন। এই রাগানুগা সাধনাকে কর্তাভজা সম্প্রদায় পাঁচটি ভাবের মাধ্যমে সাধনা করে থাকেন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দেখ দেখ বারে বারে অবতার যখন যেমন,
ভাবিয়ে ভাবিয়ে সকল কল্লে নিরূপণ, শান্ত, দাস্য,
সখ্য দেখ আর, বাৎসল্য মধুর ভাব এই পঞ্চ
প্রকার, আর পরস্পরে ভাবে ভর করে সকলে পায়।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ে এই পাঁচটি ভাবেরই আরাধনা করে। এই পাঁচটি ভাবের সাধনাকে পঞ্চভাবের সাধনা বলে। পাঁচটি ভাবই পর পর সিঁড়ির মত।

শান্তভাব—ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দর্শনে ভক্তের চিত্ত শান্ত হয়ে আসে। কোন প্রকার ভেদ ভাব থাকে না। কোন প্রকার প্রার্থনা বা বিশেষভাব

থাকে না। চিত্ত অখণ্ড শান্তিরসে পূর্ণ হয়ে থাকে। সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। ইহা শান্ত ভাব।

দাস্যভাব—ভগবান অনন্ত, অসীম, চিন্তাতীত, গুণাতীত, ভাবাতীত। সাধকের চিত্তে ভগবানের প্রতি রতি উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমশঃ মহিমভাব দূর হয়ে মনে হতে থাকে ভগবান অনন্ত বটেন কিন্তু তাঁর সহিত আমার যে অতি নিকট সম্বন্ধ। তিনি প্রভু, আমি দাস, তিনি পিতা, আমি তাঁর সন্তান, তিনি পূর্ণ, আমি তাঁর অংশ। সাধক আকুল হৃদয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। ইহাই দাস্য ভাব।

বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় ভক্ত ভগবানের সংসারে সংসারী হয়ে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজনের প্রতি কর্তব্য পালন করেন অনাসক্ত ভাবে। কর্মফল সকল ভগবানের চরণে অর্পণ করেন। সর্বদা স্মরণে রাখেন প্রত্যেকেই ভগবানের অংশ স্বরূপ। এদের সেবা হল ভগবানের সেবা করা। এই ভাবে ক্রমে নিরাসক্ত হয়। তার সংসারের প্রতি আসক্তি ক্রমে শিথিল হয়ে আসে। পরাশান্তি লাভ করে।

সখ্যভাব—প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে একটা দূরত্ব থেকেই যায়। যতই প্রভু ভৃত্যকে আপনজন মনে করে থাকুন এই দূরত্বের জন্য উভয়ের মধ্যে কখনও আত্মবোধ জাগ্রত হয় না। কিন্তু যদি ভক্তের মনে হয় ভগবান আমার সখা, আমার বন্ধু, আমার বান্ধব, আর আমার কেহ নাই। এই ভাব জাগ্রত হলে তার মন হতে দূরত্ব মুছে যায়। তখন আপনজন হয়ে উঠেন। এই ভাবে ভগবানের-সঙ্গে ভক্তের ভালবাসা ও মেলামেশা বৃদ্ধি পায়। ভক্ত ভগবানেতে প্রাণ ঢেলে দেয়। ইহাই সখ্য ভাব।

বাৎসল্য ভাব—যখন ভালবাসা অত্যন্ত গাঢ় হয় তখন ভগবান ভক্তের কাছে বাঁধা পড়ে যান। ভক্তের কাছে ভগবান ছোট হয়ে যান। ভক্ত মনে করেন আমি না দেখলে কে দেখবে? তাঁকে কে খাওয়াবে? তাঁর কে দেখাশুনা করবে? এই ভাবে ভক্তের হৃদয়ে নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভাব উদয় হয়। ইহাই বাৎসল্য ভাব।

ভগবান মা যশোদাকে হাঁ করে বিশ্বরূপ দেখালেন। কিন্তু তাঁর সেই মহিমভাব সহ্য করতে পারলেন না। পাগলের মত হয়ে গেলেন দুঃশ্চিন্তায়। ছেলে এমন করছে কেন? কি হল? চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন। মাথার চূড়াটি হেলে পড়ল। বিন্দু বিন্দু ঘামে মুখমণ্ডল ভরে উঠল। গলায় ফুলের মালাটি ছিঁড়ে গেল। গায়ের কাপড় আলগা হয়ে গেল। ছেলের চিন্তায়—হয়ত কোন উপদেবতা ভর করেছে। তা না হলে ছেলের মুখের মধ্যে এ সব কি দেখছি। আশঙ্কায় ও দুঃশ্চিন্তার কাতর। বুকের মধ্যে ছেলেকে চেপে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

মায়ের ব্যথা দেখে ভগবানের কষ্ট হল। মায়ের আকুলি বিকুলি ভগবান আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সে ভাব সংবরণ করে আবার মধুর স্বরে 'মা' বলে কেঁদে উঠলেন। সকল আশঙ্কা ও দুঃশ্চিন্তার অবসান হল। মা যশোদা আগ্রহ করে মধুর চাহনি দিয়ে ছেলের মুখটি ভালো করে দেখে নিয়ে বুকের মাঝে চেপে ধরলেন। কি শান্তি! ইহাই হল বাৎসল্য ভাবের করুণ প্রতিচ্ছবি।

মধুর ভাব—বাৎসল্য ভাবে ভক্ত সর্বদাই তন্ময় হয়ে চিন্তা করেন। তাঁর প্রীতি রতি গাঢ়তম হয়ে প্রেমে পরিণত হয়। তখন ভক্ত ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মহারা হয়ে পড়েন। তখন সর্বত্রই ভগবৎ দর্শন হতে থাকে। ইহাই মধুর ভাব বা মধুর প্রেম। মধুর প্রেমে পাঁচটি ভাবই বিদ্যমান থাকে। মধুর ভাব সর্বাপেক্ষা উত্তমভাব। এই মধুর ভাবের সাধনা করেন সহজিয়া সম্প্রদায়গুলি। কর্তাভজা সম্প্রদায় মধুর ভাবসহ অপর চারটি ভাবেরও সাধনা করেন গুরুর সহায়তায়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দেখ আগম নিগম ক্রমে কি বিধি বিধানে,
ব্রহ্ম নিরূপণ কার ধ্যানে দেখ না কোনখানে,
যে অনির্বচ নির্বচ কদাচিৎ নয়, ভাবী
জনার উপাসনায় হতেছে নিশ্চয়, যাদৃশ
ভাবনা এবে যার, সিদ্ধি হবে ত সেইরূপেতে
তাহার, আর শশীভাবে অবশ্য পাবে সেই কল্পনায়।

তিনি অনির্বচ। তাঁর নিরূপণ সহজে হয় না। একমাত্র পঞ্চভাবের উপাসনায় তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। যিনি যে ভাবের আশ্রয়ে তাঁর উপাসনা করেন, সেইভাবেই তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ সাধ্য হয়।

ভাবের গীতে লালশশী বললেন :

দেখ গোপ গোপীর প্রাণ শ্যামরূপ অনুপম,
পতিতপাবন নাম গুণময় ধাম, ভাবের স্বরূপ
হলো বন্ধু, শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য মধু,
শশীবলে ত্রিকুলের নিস্তারকারী।

পঞ্চ ভাবের উপাসনায় তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা। তাঁর সমীপে উপনীত হয়ে তাঁর মোহন মূরতী দর্শন করা। এ সম্বন্ধে বসরার মহাতাপসী রাবীয়া বললেন—"উপাসনা যেখানে স্বার্থ সিদ্ধির উপায়, সে স্থান স্বর্গ হলেও তার মত নিকৃষ্ট স্থান আর নাই। ধর্ম কখন পরকালের সুখের প্রতিশ্রুতি দেয় না, ইহলোকের ত নয়ই। ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বর উপাসনা, হে আল্লাহ! যদি নরকের ভয়ে তোমার উপাসনা করি, তুমি আমাকে নরকেই নিক্ষেপ কর। আর এই উপাসনায় যদি স্বর্গ বাঞ্ছিত হয়, তবে তুমি স্বর্গ কেড়ে নিও। আর যদি তোমার জন্যই আমার তপস্যা হয়, তবে তুমি আমার কাছে সুন্দর মধুর হয়ে এসো।"

ভাবের গীতে লালশশী বললেন :

যাদের পঞ্চ ভাবের বাঞ্ছা হবে করিবে পরিচয়
সহজ ভাবে সহজরূপে লবে তার আশ্রয়।

ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু তিনি মানুষের হৃদয়েই বিরাজমান হয়ে রয়েছেন। হৃদয়স্থিত সহজ মানুষকে উপলব্ধি করার জন্য পাঁচটি ভাবের আশ্রয়ে সহজ সাধনা করেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ গুরুর সহায়তায়।

মানুষ সেবা—জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ স্বরূপ। ভগবান আপন লীলা আস্বাদনের জন্য পরমাত্মাকে দ্বিখণ্ডিত করে জীবাত্মার সৃষ্টি করেন। এই

জীবাত্মা মানুষের শরীরে অবস্থান করছেন। তার শক্তিতেই মানুষ চলাফেরা করে। আনন্দ উপভোগ করে। যখন জীবাত্মা মানুষের দেহ ত্যাগ করে চলে যান, তখন মানুষ নির্জীব হয়ে পড়ে। তখন আর চলা ফেরার কোন ক্ষমতা থাকে না। তখন এই দেহ মৃত বলে গণ্য করা হয়। এই মৃত দেহ দীর্ঘ সময় পড়ে থাকলে জীবাত্মার শক্তির অভাবে পচে দুর্গন্ধময় হয়ে উঠে।

মানুষকে যে সেবা দেওয়া হয়, তাহা দেহাকার বিশিষ্ট খোলসটিকে দেওয়া হয় না। সেবা দেওয়া হয় দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত জীবাত্মাকে। মানুষের সেবা দেওয়ার অর্থ জীবাত্মারূপী পরমাত্মার সেবা দেওয়া। মানুষের সেবা প্রদানে অপার্থিব প্রেমানন্দের আস্বাদন করা যায়। প্রেমানন্দের প্রভাবে স্বরূপত্ব উপলব্ধির অনুভূতি জাগ্রত হয়। নারায়ণ জ্ঞানে মানুষের সেবা করতে পারলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। অল্প কাল মধ্যে নিজেকে চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ মনে করে। শুদ্ধ ও মুক্ত ভাব ধারণ করতে পারে। মানুষের সেবা করলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারা যায়। সমদর্শীতা ভাবের ভাবী হতে প্রেরণা দান করে।

সাধারণ গৃহীর ভবনে পূজা, বিবাহ ইত্যাদি উৎসবাদি উপলক্ষ্যে বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজনকে সেবা দেওয়া রীতি প্রচলিত আছে। তাঁরা আত্ম অহংকারে ও দাম্ভিকতায় মানুষের সেবা দান করেন বলে মানুষ সেবার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারেন না। একমাত্র ধর্মীয় অনুভূতিতেই এর সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারা যায়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

মানুষের আগমনেতে, দেশের কল্যাণ হবে
নানান মতে, যেন ভানুর উদয় হলো
সাধু অনুরাগেতে।

ভানুর উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নির্দিষ্ট স্থানের অন্ধকার যেমন অবলুপ্ত হয় ও তার সুধাময় স্নিগ্ধ আলোর প্রভাবে সর্বদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তেমনি মানুষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অন্তর্নিহিত অনুরাগের প্রভায় দেশের কল্যাণ সাধিত হয়। সর্বদিকে সর্বলোকের হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দের আবেগ সঞ্চারিত হয়। সর্বলোকের মনে এক অপার্থিব

আনন্দের স্পর্শ অনুভূত হওয়ায় মানসিক কালিমা অপসারিত হয়ে যায়। লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ সেবায় সিদ্ধ, সদ্য আশা পূরণ।

এ সম্প্রদায়ে গৃহীভক্ত স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করার বাসনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সম্প্রদায়ী ভক্তবৃন্দকে আমন্ত্রণ করেন নিজ বাস ভবনে। তাঁরা আগমন করলে অতি শ্রদ্ধার সহিত তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করান। তাঁদের নারায়ণের অংশ স্বরূপ প্রতিমূর্তি উপলব্ধি করে গলায় ফুলের মালা ও কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করেন। ধূপ ধূনার সুরভিত আসরে ভাবের গীত হতে পদাবলী কীর্তনের পর তাঁদের সেবা দানে সন্তোষ বিধান করেন। তাঁদের আত্ম সন্তুষ্টির ফলে গৃহীর মনোভিলাষ অচিরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী আমন্ত্রিত ভক্তবৃন্দ সেবায় প্রদত্ত খাদ্য বস্তু নারারণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করেন। এজন্য কেহ খাদ্য বস্তুর অপচয় করেন না। গৃহীর ভবনে কিছু না গ্রহণ করেও আসর ত্যাগ করেন না।

মানষের মধ্যে অবস্থিত নারায়ণ—সহজ মানুষের অনুভূতি জাগ্রত করা ও মানুষের একাত্মবোধ আনয়ণ করে পরস্পরের মধ্য হতে বিভেদ বিলুপ্ত করাই হল মহান কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ঠ।

মানুষ হবার যোগ্যতা—শুভকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং অশুভকে ধ্বংশ করার জন্য ভগবান যুগে যুগে মানুষ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর রাজ্যে সৃষ্ট জীব ত অনেক রয়েছে কিন্তু বিশেষ করে বারে বারে মানুষ রূপে আসেন কেন? কারণ তিনি মানুষকে ভালবাসেন। মানুষই হল তাঁর লীলা সহচর। এজন্য তিনি মানুষকেই সর্বগুণে ভূষিত করে রেখেছেন। মানুষকেই তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করার ক্ষমতা দান করেছেন। মানুষের মধ্যে যেমন প্রভৃত গুণরাজি দান করেছেন তেমনি কতকগুলি অসদ্গুণেও সমম্বিত করে রেখেছেন। মানুষকে স্বাধীন চিন্তাধারা দান করেছেন। সেই চিন্তাধারার বিকাশে বুঝতে পারে কোনটা সদ্ আর কোনটা অসদ্।

মানুষ যাতে সদ্গুণে গুণান্বিত হয়ে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে অল্পায়াসে সক্ষম না হয়, তার জন্য বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সৃষ্টি করেছেন। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাকে প্রতিহত করে আপন প্রভাবে রাখার জন্য নিয়ত চেষ্টা

করে। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাব হতে মুক্ত হতে হলে গুরুর আশ্রয়ে আশ্রিত হতে হয়। গুরুর উপদেশ মত জীবন ধারণ করতে হয়। সদগ্রন্থ পাঠ ও সাধুসঙ্গ করতে হয়। ধর্মীয় বিধিগুলি ধৈর্য্য সহকারে নিষ্ঠার সহিত পালন করতে হয়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যারা নিন্দা করে বারে বারে আরের সাক্ষাতে,
ভবসিন্ধু তারণবন্ধু ভাববে মনেতে।

যারা বারে বারে অপরের কাছে নিন্দা করে। নিন্দা শুনে সকলেই ক্রোধে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। নিন্দা শুনে মন উদীপ্ত হওয়া মানবীয় ধর্ম। শশীলাল সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে যারা নিন্দা করে, তারা ভব পারের কান্ডারী বলে মনে করবে। কারণ নিন্দাতে চারিত্রিক দোষ ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে। সেগুলি সংশোধন করতে পারলেই সদ্ বৃত্তিগুলি ক্রমশ প্রকাশমান হতে থাকে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

কোনো রোগা কাউলে গাল দিলে শুনলে হবে
খুসী, দোষী হয়ে কেউ এসে ভয় পেয়ে, বুঝিয়ে
আপনি হবে দোষী, অতি জীর্ণ শরীর যে ব্যক্তির
কাতর অন্তঃকরণ, বন্ধুভাবে বন্দিবে আনন্দিত
হয়ে তার অভয় চরণ।

কোন ব্যক্তি দোষী হয়ে যদি আপনার অপরাধ স্বীকার করে, পাপ কার্য্যের জন্য ভীত হয়, তাহলে পাপীকে ঘৃণা না করে নিজে দোষী হয়ে তাকে রক্ষা করবে। যে ব্যক্তির জীর্ণ শরীর, আশ্রয় বিহীন, উপায় সম্বলহীন, শারীরিক কারণে মূহ্যমান, কাতর অন্তঃকরণে সাহার্য্য প্রার্থী হয়, এরূপ ব্যক্তিকে বন্ধু ভাবে আনন্দিত হয়ে, স্বার্থত্যাগ করে, তাকে সাহার্য্য করবে। তাকে সহৃদয় অভ্যর্থনা করবে। কারণ তারা তোমারই অংশ স্বরূপ, মানবদেহরূপী নারায়ণ।

ভাবের গীতে আবার বললেন ঃ

দেখে নষ্ট দুষ্ট, অশিষ্ট রুষ্ট না হও তাতে,
আপনি শিষ্ট হয়ে তায় বুঝায়ে

বরঞ্চ না যেও সে পথে, তোমার হিংসা চিন্তা
যে লোকে কচ্ছে বসিয়ে, আপনি গিয়ে সে
লোককে মধুর বাক্যেতে আসবে তুষিয়ে।

অজ্ঞানতা, অসংযমী, আচার ভ্রষ্টতা দেখে রুষ্ট হবে না, বরং নিজে শান্ত, শিষ্ট ও সংযমী হয়ে তাকে বুঝিয়ে সদ্‌জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে। এ কার্য্য সাধনে নিজে পথ ভ্রষ্ট হবে না। যদি কেহ হিংসা চিন্তা করে, তাকে করুণা প্রদর্শন করবে। মধুর বাক্যেতে তার সহিত আলাপ করবে। মধুর ব্যবহার করবে। এর ফলে তার হিংসা নিন্দা করার উম্মাদনা ক্রমশ প্রশমিত হয়ে আসবে। পরিশেষে সেও মধুর ব্যবহার করার জন্য আগ্রহী হবে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

লোকের বিষয় হলে কেউ কিছু চাহিলে, আচ্ছা বলে
যা পাবে তাই দিবে। লালশশী বলে কেউ
কিছু চাহিলে আচ্ছা বলে যা পাবে তাই দিবে।

বিষয় সম্পত্তির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে, নিঃস্বার্থ ভাবে উহার রক্ষক হয়ে আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করবে। অভাবের তাড়নায় নিপীড়িত হয়ে কেহ কিছু প্রার্থনা করলে, হৃষ্ট চিত্তে যা পারবে তাই দিবে। তাকে বিমুখ করবে না। অভাব ক্লিষ্ট মনে একটু শান্তি লাভ করবে। উভয়েই একই পরমাত্মার অংশ স্বরূপ মানুষ এই সত্য সর্বদা স্মরণে রাখলে সর্ব মানুষের প্রতি সমভাবাপন্নতার বোধ জাগ্রত হবে।

এই ভাবে সদ্‌ভাবে ভাবিত হয়ে জীবন পরিচালনা করলে তার মধ্যে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, সমদর্শিতা, স্নেহ, দয়া, মায়া, সত্য, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য্য ও সংযমমূলক গুণগুলি মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে থাকে। এই গুণগুলি সম্যক বিকশিত হলে প্রমাণিত হয় যে মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ নামের সার্থকতা লাভ করে। মানব দেহ ধারণ করা সফল হয়। মানুষ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

কিন্তু মানুষ যখন সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে আশ্রিত হয় না, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সাধুসঙ্গ করে না, তখন বিধাতার প্রদত্ত সদ্‌গুণগুলি প্রস্ফুটিত হতে পারে

না। ক্রমশই তাহা লুপ্ত হতে থাকে। এই অবস্থায় বহিরঙ্গা মায়াশক্তি আপন প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ ক্রমে ক্রমে পাপের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

মিছে রঙ্গরসে সঙ্গদোষে আতঙ্ক হয় সদক্ষণ,
লালশশী রচে সঙ্গদোষে আতঙ্ক হয় সদক্ষণ।

সঙ্গ দোষে ও রঙ্গ রসে মোহাবিষ্ট হয়ে পাপ কার্য্যে লিপ্ত হয়। চিৎশক্তির প্রভাবে ক্ষণিক বিবেক উদয় হলেও তৎক্ষনাৎ আবার মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। এই দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে একটা আতঙ্ক সর্বদা হৃদয়ে অনুভব করে। নিজের কর্মফলের অপরাধ জনিত কাজের জন্য সদক্ষণই তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। এই ভীতি ও সন্ত্রস্ততা দূরীকরণের জন্য তার ইন্দ্রিয় গুলি অত্যন্ত চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। মন ইন্দ্রিয়াদির ক্রীড়ানক হয়ে পড়ায় সে স্বাধিকার হারিয়ে ফেলে। ইন্দ্রিয়গুলির প্রভাবে মন চালিত হতে থাকে।

এর ফলে মিথ্যাকে সত্য বলে বরণ করে নেয়। মানুষ বিবেক বর্জিত হয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠে। স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে অন্যায় পথ অবলম্বন করতে ও অপরের ক্ষতি করতে দ্বিধা বোধ করে না। অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। হিংসায় ও বিদ্বেষে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে ও অপরের অনিষ্ট চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় লালসায় বিমুগ্ধ হয়ে অপর ললনার উপর ইন্দ্রিয় লালসা তৃপ্ত করতে মাতোয়ারা হয়ে উঠে। স্বেচ্ছাচারিতায় বলীয়ান হয়ে অপরের অনিষ্ট করে পুলক অনুভব করে।

এই প্রকারে পাশবিক গুণগুলি বিকাশের ফলে সেই মানুষটি চিত্তহারা হয়ে বর্বর ও পাষন্ড মূর্তিতে সকলের কাছে ভীতির বস্তুতে পরিণত হয়। তখন তারা পশুর তুল্য হয়ে উঠে। মানুষ নামের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। মানব জীবন ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়। চিরকাল তার স্মৃতিতে কলঙ্ক আরোপিত হয়ে থাকে।

মরীচিকাময় সংসার—পরমাত্মার অংশ স্বরূপ জীবাত্মা। জীবাত্মা মানুষকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। মানুষ একদিন পূর্ণানন্দের আস্বাদন করেছিল।

সেই আনন্দের অনুভূতি বজায় থাকে মানুষের শরীরে। এই আনন্দ উপভোগের জন্য স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বিষয় সম্পত্তির মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়। খুঁজতে থাকে সেই অপার্থিব আনন্দ। কিন্তু মনে আনন্দের সঞ্চার হয় না। কোন বিষয়ে তৃপ্তিও লাভ করতে পারে না। বিভ্রান্ত হয়ে অন্বেষণ করে একটু আনন্দ পাওয়ার জন্য। এই ভাবে বৃথা অন্বেষণে দিন বয়ে যায়। একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

মন মহামায়ায় মোহিত হয়েছ,
পরমার্থতত্ত্ব সকল ভুলেছ, যদি ভ্রান্তি গেল না,
অন্তকালে কি হবে চিন্তা করলে না,
আছে ভেবে দেখ শিয়রেতে বসে শমন।

এই পদের মর্মার্থ অনুধাবনের জন্য মহাভারতের ঘটনাবহুল অংশের একটা ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল।

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির বন মধ্যে ভ্রমণ করছিলেন। যুধিষ্ঠির দেখলেন, এক মধুলুব্ধ যুবক হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে আর উপর থেকে এক একটি ফোঁটা মুখে পড়ছে। যুবকের পিছনে এক বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করে এগিয়ে আসছে তাকে দংশন করবার জন্য। সে দিকে তার নজর নাই।

এই দৃশ্য দেখে বেদনাহত হয়ে যুধিষ্ঠির চিৎকার করে যুবককে পালাবার জন্য বারংবার বলতে লাগলেন। তবুও যুবক নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল ও বলল যে আর এক ফোঁটা মুখে পড়লেই পালাবে। ইত্যবসরে বিষধর সর্প এসে তাকে দংশন করল। যুবক ঢলে পড়ল।

এই নিদারুণ করুণ দৃশ্য দেখে যুধিষ্ঠির কাতর হয়ে পড়লেন। ভগবান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন! "হে যুধিষ্ঠির—তুমি ক্ষুণ্ণ হচ্ছ কেন? যাহা দেখলে ইহাই সংসার চিত্র। সংসারে সর্বদাই এই প্রকার অভিনয় হচ্ছে। ঐ মধুচক্রই সংসার, আর ঐ মধুর ফোঁটাই কামনা বাসনা বৃত্তি, আর ঐ সর্পটিই মৃত্যুরূপী মহাকাল। মায়া মুগ্ধ জীব সংসার চক্রে আবদ্ধ হয়ে, উন্মত্ত কামনার, বাসনার চির অতৃপ্তি নিয়ে মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। মৃত্যু সন্নিহিত হলেও দুরাশা পরিত্যাগ করতে পারছে না। একবারও মৃত্যু

চিন্তা করছে না। এই রূপে জীবগণ দুরাকাঙ্ক্ষার তীব্র হলাহলে জর্জরিত হয়ে অতৃপ্ত বাসনার জ্বালাময়ী উত্তাপে বিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর করাল কবলে চির-বিশ্রাম লাভ করছে।"

কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রাণের ঐকান্তিক টানে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ অকালে মৃত্যু বরণ করে। প্রাণের এই ঐকান্তিক টান কামনা বাসনা হতে ফিরিয়ে শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করলে পরমপদ লাভ করতে পারা যায়।

ভক্ত বললেন ঃ

যা চিন্তা ভুবি স্ত্রী পুত্র পৌত্র ভরণ ব্যাপার সম্ভাষণে
যা চিন্তা ধন-ধান্য-ভোগ-যশ সংলাভে সদা জায়তে।
সা চিন্তা যদি নন্দ-নন্দন পদদ্বন্দারবিন্দে ক্ষণং
কা চিন্তা যমরাজ-ভীম-সদন-দ্বার প্রয়াণে প্রভো॥

হে প্রভু! এ সংসারে স্ত্রী পুত্র, পৌত্রাদির সন্তোষ ও ভরণ পোষণের নিমিত্ত যেরূপ ঐকান্তিক চিন্তা করা হয়, যশোলাভের জন্য এবং ঐশ্চর্য্যাদি বিষয় ভোগের জন্য যেরূপ চিন্তা করা হয়, সেইরূপ চিন্তা যদি নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যুগল চরণ কমলে ক্ষণকালের জন্যও অর্পিত হয়, তাহলে ভীষণ যমরাজের দ্বারে যাইতে অর্থাৎ মৃত্যুতে আর চিন্তা কি ?

সাকার ও নিরাকার—নিরাকার অর্থ আকার শূণ্যতা। ভগবানকে কোন আকারে আবরিত করা যায় না। কারণ তিনি অনন্ত, অসীম, অব্যক্ত, অবাঙ্ মনসোগোচর, একমেবাদ্বিতীয়ং। আবার তাঁকে সাকার রূপেও দেখতে পাওয়া যায়। সাকার নিরাকার দুইই মানতে হয়। না মানলে পরম শূণ্যতার মধ্যে এসে পড়তে হয়। এই সব সত্যের জীবন্ত সাক্ষ্যের মধ্যে শ্রুতিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান।

সৃষ্টির পূর্বেকার পরমশূণ্যতা বুঝাতে গিয়ে ঋষি বললেন, ঋগ্বেদ হতে বললেন— "তখন না ছিল সৎ, না ছিল অসৎ। তখন না ছিল মৃত্যু, না ছিল অমৃত। তাঁকে ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন ছিল সকল দিকে কেবল অন্ধকার। সৃষ্টির পূর্বে তখন অন্ধকার দিয়ে আবৃত ছিল অন্ধকার। কেই

বা ইহার রহস্য যথার্থভাবে জানে, কেই বা বলিতে পারে। কোথা হতে জন্ম এইসব, কোথা হতে আসিল এই বসুধা, বিচিত্র সৃষ্টি!

সেই আদিতে বিশ্বের কিছুই ছিল না। যেন মৃত্যু দ্বারা সব কিছু সমাচ্ছন্ন।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বললেন: "তাঁর কিছু মাত্র আনন্দ ছিল না। একাকী কারও আনন্দ হয় না। তিনি দ্বিতীয় সহচর চাইলেন। তাই এই আত্মাকেই তিনি দ্বিধা বিভক্ত করলেন। তিনি কামনা করেছিলেন আমার একটি দ্বিতীয় আত্মা হউক। সাকার ও নিরাকারে এই সৃষ্টি পূর্ণ হয়ে উঠল। ক্রমে প্রাণ, দিক, কাল, বিচিত্র সৃষ্টি তাহা হতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সৃষ্টি সূক্ষ্ম হতে ক্রমে স্থূলের দিকে চলল। তাঁর কামনা পূর্ণ হল।"

প্রকৃত জ্ঞানীর বা ভক্তের কাছে সাকার ও নিরাকার উপাসনা উভয়ত সমান। উভয় ভাবই সত্য। সাকার ও নিরাকার উপাসনা সাধনার দুটি পর পর স্তর মাত্র। নিরাকারের ঘরে যেতে হলে সাকারের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হবে। ভগবানের সগুণ অবস্থাতে সাকার ও নিরাকার এই দুই ভাবই বিদ্যমান আছে। নিরাকার ছাড়া সাকারের অর্থ নাই, আবার সাকার ছাড়াও নিরাকারের কোন প্রকাশ নাই।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

তিনি নিরাকার পরাৎপর সাকার গৌরব,
চরাচর আচার দুর্লভ তাঁর কৃপাতে সম্ভব।

সাকারেই তাঁর গৌরব। সাকারের জন্যই তিনি লালায়িত। তা নইলে, তিনি অনন্ত, অসীম, অব্যক্ত, অবাঙ্মনসোগোচর রূপেই থাকতে পারতেন। সাকারের ইচ্ছা হল কেন! কারণ তিনি লীলাময়, সাকারের মাধ্যমে লীলা আস্বাদনের মানসে। সাকারে তিনি ভক্তের নয়নগোচর হন। তিনি ভক্ত বৎসল। ভক্তই যে তাঁর লীলা খেলার সহচর।

তিনি এই যে সাকারের বন্ধন স্বীকার করলেন, ইহাতে তাঁর কোন দৈন্য বা লজ্জার হেতু নাই। এই বন্ধনে তিনি আপনার প্রেম আপনি স্বীকার করলেন। নারী যেমন পত্নী বা মাতা হয়ে প্রেমের বন্ধন স্বীকার করে। তখন কি তাতে তার কোন দৈন্য বা লজ্জা সূচিত করে? প্রেমের বাঁধন তিনি নিজে

স্বীকার করলেন, এইখানেই তাঁর প্রীতিতত্ত্ব প্রকাশ। তাঁর আনন্দের পরিপূর্ণতার প্রকাশ।

ভগবানের সগুণ অবস্থাতে সাকার ও নিরাকার এই দুই অবস্থাই বিদ্যমান আছে। সাকারেই নিরাকারের গৌরব। সাকার ছাড়া নিরাকার আপন সত্তা প্রকাশ করতে পারে না। সাকারই তাঁর শক্তি। এই শক্তি ছাড়া শিবও পঙ্গু, অসক্ত। তাই আনন্দ লহরীতে শংকরাচার্য্য বললেন—শিব যদি শক্তির সঙ্গে যুক্ত হন, তবেই তিনি প্রভু, শক্তি সম্পন্ন। নইলে এমন যে দেবতা, শক্তি ব্যতীত তাঁর একটুও স্পন্দিত হবার ক্ষমতা নাই।

প্রকৃতি পুরুষের সংযুক্ত অবস্থাই সগুণ ব্রহ্ম। প্রকৃতি উপাদান-কারণ তাই সাকার। পুরুষ নিমিত্ত কারণ তাই নিরাকার। নির্গুণ অবস্থা কেবল নিরাকার। দৃশ্যমান জগতটা প্রকৃতির সাকার মূর্তি আর জগতের প্রতি অনুপরমাণুতে বিরাজিত চৈতন্য সত্বা নিরাকার। জীবদেহ মাত্রই সাকার আর আমাদের দেহী বা আত্মা নিরাকার। সেইরূপ দেহটা সাকার আর আমাদের আমিত্ব (আত্মা) নিরাকার।

সাকার হল ঘর আর নিরাকার হলেন প্রদীপ। ঘর ছাড়া প্রদীপ অর্থহীন, আবার প্রদীপ ছাড়া ঘরও অন্ধকার। এজন্য ঘরের মধ্যেই সেই প্রদীপের সন্ধান করতে হয়। বনে বনে ঘুরে সেই প্রদীপের সন্ধান পাওয়া যায় না।

মুণ্ডক উপনিষদ্ বললেন—"তিনি মহান, দিব্য, দীপ্যমান ও অচিন্তরূপে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত। দূর হতেও তিনি সুদূরে, তিনি আবার এই স্থানে, নিকটে। এই স্থানে এই সব সচেতন জীবগণের আত্মাতে তিনিই বিরাজিত।"

মাহাত্ম কবীর বললেন ঃ

নির্গুণ হ্যায় সো পিতা হামারা, সগুণ হ্যায় মাহ্‌তারী
কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।

আমার পিতা হচ্ছেন নির্গুণ আর মাতা সগুণ। এখন কাকেই বা নিন্দা করি আর কাকেই বা বন্দনা করি, দুজনাই সমান।

ভারতীয় সাধক সম্প্রদায় সকল প্রকার ভগবৎ উপাসনাকেই দুটি ভাব ধারার মধ্যে একটিকেই অবলম্বন করে সাধনা করেন। প্রকৃতপক্ষে সাকার নিরাকারের

কোন প্রভেদ নাই। অধিকারী ভেদে সাধনার জন্যই ঐ প্রকার স্তরের বিভাগ মাত্র। কিন্তু ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ে দুটি ভাব ধারাকেই অবলম্বন করে সাধনা করে থাকেন। দুটি ভাব ধারার মধ্যে নিরাকার ভাবের অধিশ্বরী হয়ে পূজিতা হচ্ছেন সত্য স্বরূপা সতীমা। তিনি সমাধিস্থ হয়ে নিরাকার স্বরূপা মহাশক্তি রূপে সমাধি মন্দিরে বিরাজমান হয়ে রয়েছেন। অপর সাকার ভাবটির অনুরূপ দুর্গা, কালী ইত্যাদি দেব দেবীর অর্চনা করা হয়। সাকার ভাবটি সম্যকরূপে মূর্ত হয়ে রয়েছে মানুষ মূর্তিতে। এ সম্প্রদায়ে গুরুই হলেন ভক্তদের কাছে ভগবানের সাকার মূর্তি। এজন্য এ সম্প্রদায়ে গুরু পূজা ও গুরু আরাধনা করার বিরাট সমারোহ দেখা যায়। ভবপারের কান্ডারী রূপে গুরু ভক্তদের হৃদয়ে পূজিত হয়ে রয়েছেন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন :

সে সবিকার নির্বিকার যার যেই ভাব,
উপাসনা হেতু প্রীত সাকার প্রভাব, যেরূপ
সহিত মিলন, সেরূপ আরোপে দর্শন,
শয়নে স্বপনে জাগে হিয়ার মাঝে।

ব্রহ্মজ্ঞানাদি জ্ঞান আহরণের জন্য একজন আত্মজ্ঞানী গুরুর অনুগত হতে হয়। তাঁর আরাধনা করেন উহা অর্জনের জন্য। তার মন সর্বদাই গুরুর প্রতি নিবন্ধ হয়ে থাকে। এই গুরুই হলেন শিষ্যের সামনে সাকার মূর্তি যিনি জ্ঞান দান করছেন। এজন্য সাকার ছাড়া নিরাকারের কোন প্রকার মর্য্যাদা থাকে না এবং প্রকাশও থাকে না।

জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব—মানব মূর্তি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি। তাঁর সৃষ্টির মূর্ত প্রকাশ। আত্মার স্বরূপটি হল নির্গুণ। যখন বহিরঙ্গা মায়ার কবলিত হয় তখন আত্মার নাম হয় পুরুষ। জীব দেহে এই পুরুষ আছেন। এই পুরুষই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে প্রকৃতির গুণ সকল ভোগ করে। প্রকৃতির গুণে বন্ধ হয়, মুগ্ধ হয়। তখন "আমি আমার" এই জ্ঞানে স্ফীত হয়ে পড়ে। প্রকৃতির ধর্ম হল মানুষকে মায়া জালে আবদ্ধ করে রাখা, যাহাতে তার স্বরূপ উপলব্ধি করার সুযোগ না পায়। তার চিন্তায় স্বরূপ বিস্মৃত

হয়। আত্ম বিস্মৃতির সুযোগে অবিদ্যা তার চিত্তকে অধিকার করে বিভ্রমের সৃষ্টি করে। স্থূল দেহরূপ অনাত্মার আত্মবোধ জাগ্রত করে এবং নিজেকে পৃথক, খণ্ডিত, অশুদ্ধ, অহং জ্ঞানের উৎপাদন করে। জীবরতির ফলে বাহিরে স্ত্রী পুরুষে বিভেদ জ্ঞানের প্রতীতি জন্মায়।

শাস্ত্রকার বললেন ঃ

পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিব ঃ

পাশবদ্ধ হয়ে পড়ে জীবত্বের প্রভাবে। ঘৃণা, শংকা. ভয়, লজ্জা, নিন্দা, কুল, শীল ও মান এই আট প্রকার পাশে আত্ম সমর্পণ করে। এইভাবে মানুষের চিত্তবৃত্তি বন্ধনের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অহং জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। ক্রমে ক্রমে তার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তার অন্তঃকরণ অশুদ্ধতায় ভরে যায়।

এই ভাবে অজ্ঞানের ঘোরে অন্ধকারময় মলিন রাজ্যে কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত অন্ধভাবে ঘুরে মরে। ঘাত প্রতিঘাতময় জীবনে অনন্ত দুঃখ, কষ্ট, ও মনবেদনায় মানুষ মগ্ন হয়ে থাকে। জরা বার্ধক্য জনিত ব্যাধি ও যন্ত্রণার শিকার হয়। মলিন মায়া অতিক্রম করা সহজ সাধ্য নয়। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন-"মম মায়া দুরতায়া"। কেহই তার অধিকার পরিত্যাগ করতে চায় না। যখনই কেহ তার উপর মায়ার ক্রিয়াকে শিথিল করতে উদ্যত হয়, তখনই মায়া যেন তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাকে বজ্র মুষ্ঠিতে ধরে রাখতে চায়। নানা প্রলোভন বিস্তার করে হোক, অথবা সাধন-পথে নানা প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করেই হোক, যে কোন প্রকারে তাকে অজ্ঞান তিমিরে নিমজ্জিত করে রাখার সর্ববিধ চেষ্টা করে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

হতভাগার জিহ্বায় আলিস্যি
এমন মধুর নামামৃত তাও হল বাসি।

এই ভাবে জীবত্ব দশায় আবদ্ধ হয়ে পড়লে তখন আর মধুর হরিগুণ-গান করতেও আগ্রহ থাকে না। জীবত্ব দশার ফলে অসৎ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দেখ সর্বমতে শ্রেষ্ঠ জীব শুদ্ধ যদি হয়
সে জীবের জীবত্ব হলে দূর তাকেই মানুষ কয়।

যিনি এই অষ্ট পাস হতে মুক্ত হতে পারেন, তিনিই সদাশিব ঈশ্বর তুল্য মানুষ। মায়া মোহ হতে মুক্ত অবস্থাই ঈশ্বরত্ব। একবার নিজ চৈতন্য স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থাৎ আত্মায় আত্ম জ্ঞান ফিরে পেলে তখন সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়। স্ত্রী পুরুষের বিভেদ জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। পরমাত্মাই একমাত্র সুখের নিদান। সেই সুখময় আত্মার সহিত আত্ম চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত জীবাত্মার সংযোগ সাধিত হয়। উপলব্ধি করে যে পরমাত্মাই একমাত্র সহজ বস্তু।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

ওরে ভাই সকল আপ্ত সুখ কদাচিত অন্তরে
রেখ না, আপ্ত সুখ থাকতে রে ভাই সহজ
বস্তু মিলবে না।

আত্মসুখ জনিত সর্ববিধ কামনা বাসনা হতে এক কথায় জৈব-তৃষ্ণা হতে নিবৃত্ত হয়ে দশেন্দ্রিয় ও চিত্তকে অন্তর্মুখ করা। এই ভাবে অন্তর্মুখ করা সহজ সাধ্য নয় বলে গুরুর আশ্রিত হতে হয়। তাঁর প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করা, ভগবানের চিন্তা ও ধ্যান করা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা, সদ্‌সঙ্গ করা, ভগবানের লীলা প্রসঙ্গ আলোচনা ও কীর্তন করা।

এইভাবে আত্মসুখ হতে নিবৃত্ত হয়ে সাধন করার ফলে বহির্বৃত্তি সমূহের শক্তি ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। বৃত্তি সমূহ বহির্জগৎ হতে অন্তর্মুখী হতে থাকে। তখন আর কোন প্রলোভনের অস্তিত্ব থাকে না। জীবত্ব দশা তিরোহিত হয়। ঈশ্বরত্ব বোধ জাগ্রত হয়। তখন ভক্ত প্রকৃত মানুষ হয়ে সহজ মানুষের শরণাপন্ন হয়। ভক্তের মনে এক অপার্থিব আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হতে থাকে। সেই সুখময় পরমাত্মার সহিত আত্ম চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত জীবাত্মার সংযোগ সাধিত হয়। সহজ বস্তু লাভে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

লালশশী পদের মাধ্যমে উপদেশ দান করেছেন যাতে ভক্তবৃন্দ জীবত্ব দশা হতে মুক্ত হতে পারে। ঈশ্বরত্ব বোধ জাগ্রত হয়। গুরুর নির্দেশে জীবন পরিচালন করায় ভক্তের মানসিক সচেতনা জাগ্রত হয় এবং জীবত্ব দশা হতে মুক্ত

হতে থাকে। ঈশ্বরত্ব বোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে প্রকৃত মানুষ হয়ে সহজ মানুষ-মনের মানুষের সান্নিধ্য লাভ করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

সাধুসঙ্গ—লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

সঙ্গগুণেতে ভবতরঙ্গে নিস্তার, তবে সে রং
ধরিবে ইঙ্গিতে করিবে পার, ঘুচিবে মনের আঁধার ;

সাধুজনার সঙ্গ অপার মহিমা সমন্বিত। যাঁরা সদ্ সাধু, তাঁদের হৃদয় ভগবৎ রসে পরিপূর্ণ। সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে থাকেন। জীবত্ব দশার লেশমাত্র তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। সর্বদাই ঈশ্বর আরাধনায় নিমগ্ন থাকেন। এইরূপ সাধুর সংস্পর্শে সেই স্থানের আলো বাতাসও পবিত্র হয়। ধর্মীয় আবেশে সর্বত্র পরিপূর্ণ থাকে। তাঁদের সঙ্গলাভ করলে মনের মালিন্য দূরীভূত হয়, কামনা বাসনা পরিশুদ্ধ হয়। মনে স্বাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হয়। তাঁদের সঙ্গ গুণে ভক্তের মানসিক পবিত্রতা ও ভগবৎ ভাবের বিকাশ হয়। মায়া মোহ সমাচ্ছন্ন ভব সংসার হতে নিস্তার পাবার একমাত্র উপায় হল সাধুসঙ্গ।

জগৎগুরু ভগবান শংকরাচার্য্য বললেন ঃ

ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

ক্ষণকালের জন্যও সৎসঙ্গ করিলে, উহাই ভব সমুদ্র পারের নোকা স্বরূপ হইয়া থাকে।

চৈতন্য চরিতামৃত বললেন ঃ

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

সাধুসঙ্গের প্রভাব অসীম। বহু জন্মের সুকৃতি না থাকলে কেহ সাধুর সংস্পর্শে আসতে পারে না। সাধুর স্বাত্ত্বিক আচার ব্যবহারে অভক্তও ভক্ততে পরিণত হয়। সাধুসঙ্গ প্রভাবে মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা জাগরিত হয়। মনের কালিমা বিদূরিত হয়ে যায়। ঈশ্বর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহার বীজ তার মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

করে কাম সাগরে কামনা ব্রহ্মপদ পাইব,
তুচ্ছ করে আবার এসে ফিরে সাধুর শরণ লব,
সাধপ্রসঙ্গে আর সঙ্গে সে অঙ্গীকারী হয়,
সরোজে তার হিয়ার মাঝে বিরাজে আপনি
গুণময়, আমরা তাই ভেবে যাই আসি ভবে
চাই সাধুসঙ্গ, উথলে যার গন্ধ পেলে
আনন্দে প্রেমতরঙ্গ।

ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হবার যে প্রচেষ্টা, তা হতে বিরত হয়ে সাধুর শরণ লওয়া প্রশস্ত। সাধুর প্রসঙ্গ আলোচনা এবং তদনুযায়ী নিজে সদাচারী হওয়া। তাঁর সঙ্গলাভে মানসিক পরিশুদ্ধতা লাভ হয়। সাধুর প্রসঙ্গে ও তাঁর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীন ভাবে যুক্ত হয়ে থাকলে পবিত্র হৃদয় দেবালয়ে গুণময় বিরাজ করেন। মানুষ বারে বারে ভবে যাতায়াত করছে সাধুসংগ লাভ করার সৌভাগ্যবান হতে। সাধুর সংস্পর্শে এলে এবং তাঁর সংগলাভ করলে হৃদয়ে আনন্দের প্রেমধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এই আনন্দের মধ্যেই আনন্দময় বিরাজ করেন। এজন্য শ্রুতি বললেন—"রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ ভগবান রস বা আনন্দ স্বরূপ, সকল রসই তাঁহাতে বর্তমান।

নিত্যানিত্য—লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

নিত্য ধন ত্যজ্য করে সদক্ষণ অনিত্যে হয় মতি,
প্রেমানন্দে অভয় পদারবিন্দে আনন্দে হয় না
প্রবৃত্তি। এমন সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গ ভঙ্গ করিয়ে,
বিষয়ারণ্যে সসৈন্যে বল কি জন্যে ফিরছ ভ্রমিয়ে।

নিত্যধন হল জীবাত্মা যাহা পরমাত্মার অংশ স্বরূপ। জীবাত্মা হল নিত্য-বস্তু, আনন্দের নিকর, অব্যয়, শাশ্বত, অবিনশ্বর, সত্য স্বরূপ। কিন্তু নিত্য বস্তুকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে অনিত্য শরীর। যে শরীর জরা, ব্যাধির আগার, ক্ষণস্থায়ী ও বিনাশশীল।

মানুষ একদা পূর্ণানন্দের আস্বাদন করেছে, তারই সূক্ষ্ম অনুভূতি সংস্কার রূপে মানুষের মনে বিরাজ করে। মানুষ পূর্ণানন্দের আস্বাদনের আশায় উন্মত্ত হয়ে উঠে। ভুলে যায় পূর্ণানন্দের উৎস জীবাত্মা রূপী পরমাত্মা। তাঁর প্রতি আসক্ত না হয়ে মহামায়ার কুহক জালে জড়িত হয়ে পড়ে। তিনি কোথায় আছেন, কেমন করে তিনি আমায় রক্ষা করছেন, তিনিই ভগবান আত্মা, তিনি আমার অতি নিকটে, জগতে যা কিছু দেখা যায় অথবা শোনা যায়, তিনি তার কিছুই নন অথচ সবের মধ্যে তিনি আছেন, তিনি না থাকলে দেহ জড় ও বিশ্বজগৎ জড় হত, কারও অস্তিত্ব থাকত না। এই সমস্ত তত্ত্ব উপলব্ধি করার সাধনা না করে ইন্দ্রিয়াদির আকর্ষণে তাদের নিকটে আত্ম সমর্পণ করে পূর্ণানন্দের আস্বাদ অনুভব করার জন্য মানুষ উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠে। উদভ্রান্ত হয়ে স্ত্রীসংগ বিষয় বৈভব, মান মর্য্যাদা, ও উপাধির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এইভাবে কেবল ছুটোছুটি করতে থাকে, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। এইভাবে অতৃপ্ত কামনায় ছটফট করে। অনিত্য বস্তুকেই সুখের আকর মনে করে তার পিছনে ছুটে। দৌড়াদৌড়ির ফলে ক্রমে ক্রমে ভ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। দৈহিক শক্তিও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসে। হা-হুতাশ করে একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দেখ আনন্দে বিভোর নর পরস্পর সবে,
ভাবে না এ ভবে ত্রাণ কিরূপে হবে।

এই অজ্ঞানতা দূর না হলে অনিত্যের প্রতি আসক্তি লোপ পায় না। এই অজ্ঞানতা হল ভ্রম। এই ভ্রম বশতঃ কতই না দুঃখ কষ্ট ভোগ করে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দেখ অশীত লক্ষ্য প্রকারে দেহ ধারণে, কি করি কি
না করি বুঝতে পারিনে, প্রথম সৃষ্টি হতে এই
পথেতে ফিরতেছি ভাই, রঙ্গরস হচ্ছে মিছে এক
নিমেষ ভঙ্গ নাই তাতে, আমি যেচে এলাম
যচ্চরাচর লোকাচার স্থাবর জঙ্গম, হায়রে
কি হলো কেন যায় না মনের ভ্রম।

ভ্রম, অজ্ঞানতা, নরানন্দতা দূর করার প্রকৃষ্টতম উপায় হল স্বরূপ উপলব্ধি করার আন্তরিক প্রচেষ্টা। স্বরূপ আনন্দই একমাত্র দান করতে পারে অনিত্যতার নাগপাশ হতে মুক্ত হওয়ার শক্তি। তখন অনিত্যের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়ে নিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি লাভ করে। নিত্যের অনুসন্ধানে সতত রত হয়। আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে। পূর্ণানন্দের আস্বাদনে সৌভাগ্য লাভ করতে ধাবিত হয়। মোহান্ধকার রূপ ভ্রম দূর হলেই স্বরূপ উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে। নিত্যানিত্য সম্বন্ধে একটা সাংসারিক দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হল।

মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে তার মা আলুলায়িত কেশে আকুলভাবে ক্রন্দন করছে। তখন দৈবক্রমে জনৈক সাধু সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'মা তোমার গোপাল ত তোমার কোলে রয়েছে। তবে কাঁদছ কেন'? তখন জননী বললেন—'হায় বাবা, গোপাল আমার চিরদিনের মত চলে গেছে। সে আর মা বলে ডাকবে না।' তখন সাধু বললেন—'কেন মা, তুমি কোলে নিয়ে যাকে চুমু খেতে, যে মুখে ছানা, ননী, তুলে দিতে, দেহ দ্বারা তোমাকে কত আনন্দ প্রদান করতো, তাতো কিছুই নষ্ট হয় নাই। সেই গোপালের দেহটি তো অটুট রয়েছে। তবে যে বস্তুটি চিরদিনের মত চলে গেছে বললে, সে পরম বস্তুটি তুমি পূর্বে কখনও দেখেছিলে কি? না, তাকে তুমি দেখ নাই। সুতরাং যে বস্তুটির সহিত তোমার এ পর্যন্ত দেখা বা পরিচয় পর্যন্ত হয় নাই তার জন্য শোক করা তোমার উচিত নয়। যে বস্তুটি চলে গেছে সেটিই নিত্য বস্তু। তাঁর প্রভাবেই এই রক্ত মাংসের শরীরে এত সৌন্দর্য্য, এত মাদকতা।

গীতায় শ্রীভগবান বললেন ঃ

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
> ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। (২/২০)

জীবের আত্মা শরীর নষ্ট হলেও মরে না, এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। আত্মা শরীর হতে নিষ্ক্রান্ত হলে শরীর নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়।

এই শরীরের জন্য শোক করো না। যিনি আত্মা রূপে তোমার গোপালের শরীরে এসেছিলেন তাঁর শরণাপন্ন হও মা। বাৎসল্য প্রেমে তাঁকে ধরার চেষ্টা কর। তিনি আবার গোপাল হয়ে তোমার বাৎসল্য প্রেমে ধরা দেবেন। তোমার হৃদয় পূর্ণ করে বিরাজ করবেন। আর শোক করো না।" এই বলে সাধু চলে গেলেন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

ভাইরে যার গরজে এ রাজ্যে হচ্ছে সব খেলা,
তার খাতিরে বারবারে আশার সংসারে পোষাক
বদলা, তুমি যে রতনের শব্দ শুনে অগ্নি ঘুরে
যাও, তারে এনে আঁধার কোণে বসিয়ে রাখতে চাও।

বিধাতার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ। সেই মানুষ নিত্যের পথ বিস্মৃত হয়ে, অনিত্যকেই শ্রেয় বলে মনে করে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বার বার পোষাক পরিবর্তন করে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর চক্রে ভ্রমণ করে। এজন্য গুরুর আশ্রয়ে অনিত্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ প্রতিহত করে নিত্য বস্তুর প্রতি আত্ম নিবেদন করাই হল মানব জীবনের চরম সার্থকতা।

জাতি বিচার—লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

ধন্য সব মানব হৃদয়, ভিন্ন ভাব সম্ভব না হয়,
ভাবত তাবত নিত্য নারী পুরুষে, ভেদ নাই
মানুষে মানুষে, খেদ কেন ভাই এ দেশে, দেখ
হে সহজে স্বভাব বুঝে।

আপন আত্মারই অনুরূপ আত্মা তো সকল মানব দেহে বিরাজ করছেন। তখন সবাই আত্মীয়। আত্মীয়তা হওয়ার ফলে বিভেদ আসতে পারে না। জাতি বিচারেও কোন অস্তিত্ব থাকে না। এই কথাই শশীলাল স্মরণ করিয়ে দিলেন।

মানব দেহে শ্রীভগবানের পূর্ণ প্রকাশ। মানুষ বললে কোন সম্প্রদায়গত কি কোন বংশগত ব্যক্তি বলে মনে হয় না। মানুষ কথাটি হল সার্বজনীন।

৪

প্রকৃতপক্ষে এই মানুষ শব্দটির মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধির লেশ মাত্র নাই। কিন্তু এই মানুষই যখন স্বত্ব, রজ, তমঃ গুণের অধীনস্থ হয়ে পড়ে, তখনই জাতির অভিমান আসে। আত্মহারা হয়ে পড়ে। বিভেদ সৃষ্টি করে। এই তিনটি গুণ ত্যাগ না করা পর্যন্ত জাতি ত্যাগ করা যায় না।

ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ী ভক্তদের মধ্যে জাত, ঐশ্বর্য্য কিংবা বংশগত মর্য্যাদার কোন অভিমান নাই। তাদের মধ্যে সম্প্রদায়ভুক্ত কোন মানুষের প্রতি ভেদভাব কিংবা বিরূপ ভাবও নাই। যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষই হন কিংবা যে কোন বংশগত মানুষই হন, কর্তাভজা সম্প্রদায়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে সকলেই একই শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। বর্ণ হিন্দু, মুসলমান, নিম্নবর্ণ হিন্দু সকলেই তখন এক পরিবার ভুক্ত সন্তান রূপে পরস্পর পরস্পরের সহিত মেলা মেশা করে। সহৃদয়তা ও ভালবাসা বিনিময় করে।

অনেকে মনে করেন, এক সারিতে বসে অন্ন ভোজন করলে জাতি ভেদ অন্তর্হিত হয়ে যায়। এ ধারণা ভুল। ইহা জাতি ভেদের অবলুপ্তির উপায় নহে। জাতি ভেদের অবলুপ্তির উপায় হল অভিমান ত্যাগ করা, সমদর্শী হওয়া। ইহাতেই আপনা হতে জাতি ভেদ চলে যায়।

ঘোষপাড়া ঠাকুরবাড়ীতে এই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। সেখানে জাতি ভেদের কোন স্পর্শ দোষ নাই। এমনকি অন্য কোন স্থানে একত্রিত হলেও তাদের মধ্যে জাতিভেদ কিংবা স্পর্শ দোষ থাকে না। এ চিন্তা ভক্তদের মনে আসেও না। যদি কোন নবাগত ভক্ত স্পর্শদোষ সম্বন্ধে সচেতনতা বোধ করে, তাকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত নয় বলে গণ্য করা হয় এবং তার সঙ্গে অপর ভক্তরা মেলামেশা করেন না। মেলামেশা করলে ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ হবে বলে মনে করেন।

ঘোষপাড়া ভক্তদের মধ্যে জাতি বিচার না থাকার কারণ হল তাঁরা সকলেই সত্যের উপাসক ভক্ত। ভক্তের কোন জাত নাই। চন্ডালও যদি ভক্তি লাভ করে, সে আর চন্ডাল থাকে না। অস্পৃশ্য জাতির ভক্তি থাকলে শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে যায়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন :

ভক্তি করিবে সর্বজীবের প্রতি, তবে ত সে সঙ্গ পাবে,
রং ধরিবে তেমতি, ঘুচিবে যত দুর্গতি।

সকলের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। ভক্তি করলে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে যায়। একাত্মবোধ জাগ্রত হয়। অভেদ অঙ্গ ভাবতে শেখে। এর ফলে উভয়ের মধ্যে জাতির ব্যবধান মুছে যায়। জাতপাতের স্পর্শ দোষও সমূলে অবলুপ্তি ঘটে।

আর এক উপায় প্রেমের দ্বারা। প্রেমের বন্ধনে জাতি ভেদ বিলুপ্ত হয়। উচ্চ নীচ বিচার থাকে না। বৃথা বাঁধনকে উপেক্ষা করে। কারও দ্বারা শাসিত হতেও চায় না। প্রেমের স্পর্শে সমাজের সকল বিধি নিষেধ শিথিল হয়ে যায়। কারও ধার ধারে না।

কর্তাভজা সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন সকলে এক পিতা পরমেশ্বরের সন্তান। সকলে অমৃতের সন্তান। তবে আর জাতি ভেদ থাকে কি করে? এক পিতার চারি সন্তানের কি চারি জাত হতে পারে! জাতি পংক্তি প্রভৃতির বিচার মিথ্যা। মানুষের মত মানুষের সেবা করতে পারলে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। জাতি পংক্তি অগ্রাহ্য করা—এই সব কথা কোন কোন পুরাণেও বর্ণিত হয়েছে বলে শুনা যায়।

গুরু নানক বললেন ঃ

যে জন ডুবিয়া রহে সত্য পারাবারে
সেই সে কেবল তরে সংসার সাগরে
নানক, ছাড়রে বৃথা ভেদাভেদ জ্ঞান
উচ্চ নীচ কেহ নাই, সকল সমান (পদের অংশ বিশেষ)

ধর্ম বাণিজ্য—ধর্ম হল আপনার জীবনটি নিয়ন্ত্রিত ও শান্ত করা। এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই ধর্মকে ধ্বজার মত ব্যবহার করে কোন বিরোধ ঘোষণা করা বা সুবিধা আদায় করার চেষ্টা অতিশয় অন্যায়। ধর্মের নামে সুখ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা হল ধর্ম বাণিজ্য।

ধার্মিকতার আবরণে যদি অজ্ঞানী কর্মশূণ্য হয়ে শুধু জ্ঞানের আলোচনা করে, তবে সে অচিরে পাপাচারী হয়ে উঠে। বড় বড় জ্ঞানের কথায় অপরকে মুগ্ধ করে লোক সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করার চেষ্টা করে। এই প্রতিপত্তি লাভের দ্বারা তারা কুচরিত্র ও দুষ্ক্রিয়ার বহু সুবিধা প্রাপ্ত হয়। অক্লেশে সকলের চোখে ধূলি দিয়ে নিজের ইন্দ্রিয়াসক্তি সফল করতে দ্বিধা বোধ করে না।

ইহারা অদূরদর্শী হয়। আত্মসুখানেস্বী হয়ে যে কোন অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা বোধ করে না। আত্ম গরিমা ঘোষণা করতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। আত্ম প্রাধান্য স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর হয়। এর জন্য যে কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহারা অমায়িক ও মিষ্টভাষী হয়। ইহারা ভক্তদের শ্রদ্ধা ভক্তি উৎপাদনের জন্য সদাচারী ও সাধুতার আচ্ছাদন ধারণ করে ও নিজেকে পরম ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। এই সকল কাজই ইহারা ধার্মিকতার আবরণে সম্পাদন করে অতি সন্তর্পণে। এজন্য ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ অপরের দৃষ্টিগোচর হয় না।

মহাভারত—বনপর্বে বলা হয়েছে ঃ

ধর্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্মবাদিনাম্।

ধর্ম লইয়া যদি কেহ কিছু সুবিধা আদায় করিতে চাহে তাহাকে ধর্ম বাণিজ্য বলা হয়। তাহা অতি হীন ও জঘন্য।

হিন্দু মুসলমান উভয় সাধনাতেই রসিক ও প্রেমিকেরা পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু যত বিবাদ বাধাইয়াছেন ধর্ম ব্যবসায়ীর দল। কবীর বলেন—স্বয়ং ভগবানও ধর্ম ব্যবসায়ীদের ডরান।

ধর্মের নাম করে মানুষ এই ভাবে বহু পাপ করে। ইহারা নিজেদেরও অনিষ্ট করে। কর্ম ত্যাগ করার জন্য ইহাদের চিত্ত শুদ্ধি হয় না অথচ কর্ম শূন্য স্থানে ইহারা আত্ম প্রতারক ও লোক কণ্টক হয়ে উঠে। ইহারা আপনার সর্বনাশ করে, পরেরও সর্বনাশ করে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যে ধর্ম ছাড়া কর্ম করে তারে বলি ব্যভিচার
লালশশী বলে কর্ম করে তারে বলি ব্যভিচার।

অহিংসা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ—লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

জীব মাত্রে এক আত্মা, বেদ শাস্ত্র আদিতে
বলে এই কথা, যদি বিধির লিপি অভেদ
হৃদয় জীবে জীবে, ঐক্য না হয় কেন তবে।

বিধির বিধান অনুযায়ী প্রতিটি জীব পরমাত্মার অংশ স্বরূপ। জীবাত্মা যখন প্রকৃতির মায়া মরীচিকাময়-দৃশ্যাবলীর প্রতি আসক্ত হয় না, তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। আর যখন জীবাত্মা মায়া মরীচিকার-দৃশ্যাবলীর সহিত মিশ্রিত হয়, তখন পরমাত্মা হতে ভিন্ন হয়ে যায়। এজন্য দেহের সুখ, দুঃখ, তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা, শীত, উষ্ণাদি অনুভূতির দ্বারা জীবাত্মা দেহে বন্ধ হয়ে যায়। পৃথকত্ব অনুভবের জন্য জীবে জীবে মিলন হয় না বরং বিভিন্নতা, বিছিন্নতার প্রভাবে একে অন্যের প্রতিরোধ কিংবা প্রতিকূলতা করতে অগ্রসর হয়। এই প্রকার মানসিকতার জন্য প্রধানত হিংসা বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে।

জীবাত্মা দেহে প্রবিষ্ট হয়ে দেহের সুখকে নিজের সুখ মনে করে এবং দেহের দুঃখকে আপনার দুঃখ বোধ করতে থাকে। এই সুখ দুঃখ অনুভূতি দ্বারা আত্মা দেহে বন্ধ হয়ে থাকে। চক্ষু যাকে সত্য বলে, দেহাভিমানী আত্মা তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে। সুখ দুঃখ অনুভূতিই আত্মার দেহত্ব প্রাপ্তির কারণ। এই ভাবেই ইন্দ্রিয়াদির আকর্ষণে দেহাভিমানী আত্মা ধাবিত হতে থাকে।

ইন্দ্রিয়াদির দুর্বার আকর্ষণ প্রতিহত করার জন্য লালশশী জীবে জীবে ঐক্য স্থাপন করার জন্য বলেছেন। যতক্ষণ ঐক্য স্থাপন না হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে প্রীতির ভাব জাগ্রত না হচ্ছে, ততক্ষণ হিংসার পূর্ণ প্রকাশ ঘটবেই।

যখন ঐক্য স্থাপনের ফলে উভয়ের মধ্যে প্রীতির ভাব জাগ্রত হয়, পরস্পর পরস্পরে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে আগ্রহী হয়, তখনই সকলের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হওয়ায় বিশ্বেশ্বর প্রীত হন। আবার তিনি প্রীত হলেই সংসারও প্রীত হয়। এজন্য সর্বক্ষণ ইহা স্মরণ করা, সর্বজীবকে আপন জন মনে করা, তাদের সেবা করা, কোনভাবে জীবের অবমাননা না করা, প্রত্যেক জীবই একই জীবাত্মার অংশ স্বরূপ অভিন্ন বলে মনে করাই হল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধি। ইহার প্রচলন থাকায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত একাত্ম বোধে মিলিত হয়। আপন জন বলে ভালবাসে। ইহার ফলে হিংসাবৃত্তি প্রতিহত হতে থাকে। এই ভাবেই হিংসাবৃত্তির বিমোচন হওয়া সম্ভব। অহিংসার পূর্ণ প্রকাশ বিরাজ করতে পারে।

শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন :

কাম এষ ক্রোধ এষ রাজোগুণসমুদ্ভব :
মহাশনোমহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ (৩।৩৭)

রজোগুণ হতে উৎপন্ন যে কাম এবং ক্রোধ, এই উভয়ে কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। ইহারা মহাপাপরূপ, শ্রেয়োলাভ বিষয়ে এই কাম ও ক্রোধকে বৈরী বলে জানিবে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন :

ঐরি কামাদি নিরবধি হয় যদি বাধ্য আপনার,
আদি অনাদি বিধির বেদ বিধি কৃত সাধ্য হবে তার,
দশ ইন্দ্রিয়গণে বন্ধনে শূন্যে রাখিবে, অনুমান সে
প্রাণ অপান উদান সমান ব্যান সমান দেখিবে, ধরে
কর্ম ভাণ্ড কর্ম কাণ্ড খণ্ড অধরে, অনুভাবে যা
উদ্ভবে রাখবে অন্তরে, যখন মুক্তি দিয়ে ভক্তি
পেয়ে যুক্ত হয়ে থাকিবে, এমনি আনন্দ হয়ে
অমিয় সিন্ধু দেখিবে।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করার প্রধান অন্তরায় হল কাম ও ক্রোধ। ইহা মানুষের প্রধান শত্রু রূপে বর্ণিত হয়েছে। কামে ও ক্রোধে মানুষ আত্মহারা হয়ে পড়ে। মানবতার মূল্যবোধ থাকে না। এদের প্রভাবে অসংযমী হয়ে কোন গর্হিত কাজ করতেও লজ্জা বোধ করে না। এই অসংযত কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করাই হল সাধনার প্রাথমিক স্তর। সংযমী না হলে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ইহা জ্ঞানকে আবৃত করে থাকে। কাম ও ক্রোধ এমনই শত্রু যে কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। সর্বদা আগুনের মত সন্তাপ প্রদান করতে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি, মন ও বুদ্ধি এই সমস্তে অধিষ্ঠান করে থাকে। দেহকে বিমোহিত করে রাখে।

গীতায় শ্রীভগবান বললেন :

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৩।৪০

কাম ও ক্রোধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণকে একমাত্র স্ববশে রাখতে পারে মন। মন যদি অচঞ্চল থাকে, সদাচারী হয়, তাহলে কাম ও ক্রোধের শক্তি প্রশমিত হতে থাকে।

মনের চরিত্র সম্বন্ধে লালশশী ভাবের গীতে বললেন :

গিন্নী যে রন না ঘরে, আমরা করবো কি, সদা
যান তিনি ভ্রমণে, ইচ্ছা হয় যেখানে, সুধালে
আসছি বলে দেন ফাঁকি, মানে না কল্লে মানা
এই ত ঠকঠকি, দেখ সওদা শুলুক করতে যে
লোক আসতেছে হেথায়, খিড়কি সদরের চাবি
রাখিয়ে যান তিনি কোথায়, এরা দশজনেতে
যার যা ইচ্ছা করতেছে দেখাদেখি।

সংসারের সর্বময় কর্তৃত্ব যেমন গিন্নীর উপর ন্যস্ত থাকে, তার নির্দেশ মত সংসার প্রতিপালিত হয়, সংসারে শান্তি বজায় থাকে। যদি গিন্নী অবুজ হয়, অলস হয়, বারবিলাসী হয়, তাহলে সংসারে শান্তি থাকে না। সর্বত্রই বিশৃঙ্খল আচরণ পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ শরীর রূপ সংসারের সর্বময় কর্তা হল মন। এখানে মনকেই শরীর রূপ সংসারের গিন্নী বলে উল্লেখ করেছেন। মন যদি ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করে, সর্বদাই উচাটন থাকে, কারো বাধা না মানে, তাহলে মনের এই চঞ্চলতার সুযোগে দশ ইন্দ্রিয়ও বাধাহীন ভাবে তাদের চরিত্রগত ধর্ম অনুযায়ী কাজ করতে সুযোগ পায়। এইরূপে ইন্দ্রিয়াদির প্রভাবে কাম ও ক্রোধ ক্রমশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে ও পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। এর ফলে মন পীড়াগ্রস্থ হয়ে পড়ে। শরীরও পীড়াগ্রস্থ হয়ে পড়ে। পীড়াগ্রস্থ হওয়ায় ভগবৎ চিন্তা করার সুযোগ হারায়।

এই প্রসঙ্গে গ্রীসের মনীষী এপিকুরাস (341—270 BC.) তাঁর চিন্তাধারা প্রায় পাঁচ শতাব্দি ধরে এক শ্রেণীর ভাবুককে মাতোয়ারা করে রেখে দিয়েছিল। তিনি মনে করতেন, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মানুষ প্রকৃতির নিয়মে বশীভূত। মানুষের সব কিছুই মৃত্যুর মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কিছুই আর থাকে না। বুদ্ধিমানের কাজ হবে সংযত ভোগ—সম্ভোগে আত্মনিয়োগ করা। সংযম প্রয়োজন এই জড় দেহটা আর জড় মনটার জন্যই। পীড়াগ্রস্থ দেহে এবং পীড়াগ্রস্থ মনে কোন আনন্দই আসতে পারে না।

মনকে সংযত করাই হল কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনার উপায়। মনকে ইন্দ্রিয়াদির প্রভাব হতে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হল দেহে

অধিষ্ঠিত জীবাত্মারূপী ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ আরোপ করা, মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা, নাম কীর্তন করতে করতে কিংবা শুনতে শুনতে বাইরের শব্দ হতে কর্ণকে পৃথক রাখা, শ্রদ্ধাবান হওয়া, মানব দরদী হওয়া, ভক্তিতে যুক্ত হয়ে থাকা, মন যাতে শান্ত, ধীর, স্থির হয়, সেজন্য সৎসঙ্গ করা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা, সদালাপ ও সদ্‌চিন্তা করা।

এইভাবে মন ক্রমশ অচঞ্চল হয়ে এলে, ইন্দ্রিয়াদির আকর্ষণও ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয়াদির নিষ্ক্রিয়তা হওয়ার ফলে কাম ও ক্রোধের উন্মত্ততা শান্ত হয়ে আসে। মনে অনাবিল আনন্দের উদ্রেক হয়। ভগবৎ আরাধনায় মন আগ্রহী হয়। পরিশেষে শ্রেয়লাভে ধন্য হয়।

মহানির্বাণ তন্ত্র বলেছেন ঃ

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
তাঁর পূজার শ্রেষ্ঠ ফুল হল অহিংসা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।

সাধনা—এক কথায় সত্যদর্শন বা স্বরূপোপলব্ধি করার জন্য যে প্রয়াস তাকেই সাধনা বলে। স্বরূপোপলব্ধি বা সত্যদর্শনের পথ সর্বত্রই ফিরিয়া চলিবার পথ। এ বিষয়ে ভারতীয় সাধন পদ্ধতির সহিত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতির গভীর মিল দেখা যায়।

মানুষ সৃষ্টি করার কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যেন মানুষের প্রতি হিংসাবশত ইচ্ছা করিয়াই মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করে দিলেন যেন অন্তরের ভিতরে লুকান সত্যকে সে সহসা দেখে ফেলতে না পারে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দেখ ত সেই বিধি যত নষ্টবুদ্ধি ধরে, আপনার
সৃষ্টিতে বারে বারে, কত অনিষ্ট সে করে, এই কি
জানি সে বিধাতার কেমন বিবেচনা, সাধেতে
বিবাদ আর করিতেছে বঞ্চনা, লজ্জা যদি
থাকিত তার শরীরে, হিংসা সে বারে বারে
করত না সংসারে, শশী হেসে বলে চিরকাল
যার এ বুদ্ধি।

প্রজাপতি ব্রহ্মা অনায়াস লাভের দ্বারা মানুষকে সত্যের অবমাননা করতে দেন নাই। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরের দিকে সত্য বিমুখ করে দিলেন। সধারণ মানুষ বাইরের রূপটি দেখে অনুভব করে। ইহা দিয়েই তাদের কাজ কারবার। ভিতরে লুকান রয়েছে যে সত্য তা একান্ত অজানা হয়ে থাকে। বাইরেরর দিকে অন্তহীন গতি। এটাই মৃত্যু দেশের পথ। সে পথ দিয়ে বার বার যাতায়াত। এ যাতায়াতের বিরাম নাই।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দেখ জনমে জনমে এত পরিশ্রম প্রাণপণে,
ক্ষমা নাইক গমনাগমনে ভাই যাহার কারণে,
দেখ আজ নাগাদি তা তো কেউ বুঝলে
না রে ভাই, সহজে আর গরজি হয়ে
মজলগে সবাই, প্রেমী বিনে মর্ম কে
জানে, অমনি কে মনের কথা
আনবে হে টেনে, আর শশী বলে রসিক
হলে রস বিচারে।

সহজিয়া মতের সকল ধর্ম সম্প্রদায় এই সত্যকে সহজ মানুষ বলে অভিহিত করেছেন। যারা মৃত্যু দেশের পথ হতে ফিরে তাকায়, তারাই ফিরে আসে মৃত্যুহীন দেশে। তারাই লাভ করে অমৃত—সহজ মানুষ। মৃত্যুহীন দেশ হল কর্তাভজা সম্প্রদায় সহ অন্যান্য সহজিয়া সম্প্রদায়ের সহজ দেশ বা নিত্যধাম। এই মৃত্যুহীন দেশে নিত্যধামে ফিরে আসার সাধনা।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ (কঠ উপনিষদ্)

বাইরের সব রূপের ভিতর আত্মগোপন করে আছে যে "প্রত্যগাত্মন্" তাই অমৃত স্বরূপ। এই অমৃত স্বরূপের সন্ধান লাভ করতে হলে চোখ দুটিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। জন্ম মৃত্যুর পথ হতে অমৃতের সন্ধানে ফিরে যেতে হবে।

বাঁকাচাঁদ একটি পদে বললেন ঃ

এবার আপনার ভজন আপনি কর আপনি
হইয়ে সাবধান, খুব হুসারিতে থেক রে মন
পূর্ব কথা হইবে স্মরণ, ও তোর কাছের মানুষ
কাছে আছে, চেয়ে দেখ উর্দ্ধনয়নে, শূন্যেতে
আসন করে, বেদ বিধির অগোচরে, মানুষচাঁদ
বিরাজ করে অতি নির্জনে, এবার নয় দরজার
কপাট এটে বস্তু কর নিরীক্ষণ।

অমৃতের সন্ধানে যে উল্টাপথে গমন তাকেই বলা হয় উল্টা সাধন। বাইরের দিক হতে ভিতরের দিকে তাকান, বাইরের দেশ হতে অমৃতের দেশে ফিরে আসা। ইহাই উপনিষদের সাধনা, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনা, সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনা। এজন্য উর্ধ্বে সত্যপুরুষকে দর্শন করার জন্য উর্ধ্ব নয়নে তাকাতে বলা হয়েছে। এই ভাবের সাধনায় একদিন লাভ হবে যে সত্য, তিনিই পুরুষোত্তম, তিনিই অমৃতত্ত্ব, তিনিই সহজ মানুষ, তিনিই মনের মানুষ।

ইন্দ্রিয়াদির নিম্ন গতিমুখী গতিবেগকে থামিয়ে তাকে উর্ধ্বগতিমুখী করতে হবে। তবেই লাভ করা যাবে মূলে অবস্থিত সত্যকে, সহজ মানুষকে। এজন্য অধ্যাত্ম সাধনার পথ উর্ধ্বযান।

শ্রীভগবান গীতায় বললেন ঃ

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ (২।৬৯)

সর্বভূতে যাহা রাত্রি, তাহাতেই জাগিয়া থাকে সংযমী। যখন ভূত সকল জাগিয়া থাকে, তত্ত্বদর্শীর কাছে তখনই রাত্রি।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

বিখ্যাত ত্রিজগৎ জাগ্রত রাত্রকালে নয়, নিশা
ভাগের পূর্ব সবে জাগে না জাগে বলে
অসময়, সবে দেব দৈত্য জাগ্রত অত্র সম্ভবে,
পরস্পর ঐ নিরধারার পর সবার বার হবে,

যোগ্য হয়ে জাগিয়ে থেকো, পূর্ণ নিশি ভানু শশী
প্রকাশিত দেখ, এ সব রঙ্গ ভঙ্গ তরঙ্গ রঞ্জন,
নিরঞ্জন ভানু ক্ষণ হতে, লালশশী রচিত
নিশির পরিপাটি হয় নিবৃত্তি প্রভাত হতে হতে।

দিন হল কর্ম কোলাহলের কাল। রাত্রিতে যেন আমরা আপনাতে ফিরে আসি। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি জাগ্রত হয়ে বহির্মুখে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে আসে একটা অন্তর্মুখে ফিরে আসার পালা। এই তত্ত্বটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে গোষ্ঠলীলায়। ইন্দ্রিয়গুলি এখানে গরু। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তারা বিষয় ক্ষেত্র রূপ গোষ্ঠে বা বিচরণ ক্ষেত্রে বাহির হয়ে যথা সুখ বিষয় গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় আবার বেজে উঠে আকর্ষণ সূচক কৃষ্ণের বাঁশী। তখনই আসে আপন ঘরে ফেরার পালা। বহির্মুখ হতে অন্তর্মুখে ফেরার সময় রাত্রি। তাই ধীর ব্যক্তির সকল কাজ রাত্রিতে, দিবসের কর্ম কোলাহলে তার উপেক্ষা।

শ্রীভগবান গীতায় বললেন :

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ (৩।৪২)

ইন্দ্রিয়গুলি দেহ হতে শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির উপরে যিনি—তিনিই সেই পুরুষ। এখানেও দেখা যায় সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে ফিরিয়ে নিয়ে উল্টা মুখে স্তরে স্তরে পরমপুরুষে গিয়ে পৌছাবার কথা।

(খ) জীয়ন্তে মরা—লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

ভাই অভিমানে ভর করে বস্তু হারিও না, আসল
বস্তু না চিনেরে ভাই যেন মজাতে মজো না, এই রং
প্রসঙ্গে তিনটি ধর্ম আছে একত্রর, কেবা আপন
কেবা পর বুঝে কর্ম কর, দেখবে ভাই আপন
নজরে, ঠাউরে ঠাউরে লবে রে ভাই জীয়ন্তে মরে,
অতি যত্ন করে মানুষ ধরে অমনি মনের ভ্রম ঘুচাও।

যোগী সাধক যখন তার পূর্ণ স্বরূপে ফিরে যেতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁকে প্রথমে সত্ত্ব, রজ, তম গুণান্বিত মায়িক জগৎ হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সাধনা করতে হয়। আসল বস্তু না চিনে মজাতে অভিভূত না হওয়ার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। সত্য বস্তুকে আবৃত করে রাখার জন্য, ইন্দ্রিয়াদির প্রলোভনে বিবিধ রং বাহারের মজায় মানুষকে নিমগ্ন করে রাখে। এই রাখাটাই হল তাদের ধর্ম। এই ধর্ম তারা পালন না করলে সত্য মহিমান্বিত হয় না। এই প্রলোভনের মোহজাল একমাত্র গুরুর কৃপায় ছিন্ন হতে পারে। এজন্য মানুষ ধরে সাধনা করে মনের ভ্রম ঘুচাতে বলেছেন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

ভাই রিপু ছয় ইন্দ্রিয় দশ আছে যোল জনা, দেখ
তাদের কথাতে ভুলনা, যেন বস্তু মজিও না, ভাই রে
চেতন হয়ে দেখ, কার বা কোথা স্থান, রাখবে
সব স্থানে স্থানে যার যেমন আছে সম্মান,
এরা যখন হইবে শান্ত, তখন দেখবে ভাই কোথায়
আছে ঋতু বসন্ত, আর নীর ক্ষিরে একযোগে
নীর ফেলে ক্ষির বেচে খাও।

ইন্দ্রিয়গণকে অস্বীকার করার উপায় নাই। তাদের প্রলোভন থাকবেই। নিজের মধ্যে চিৎ শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত করতে হবে। তাদের স্ব স্ব স্থানে সম্মান পূর্বক নিষ্ক্রিয় করে রাখতে হবে। দুধের জলভাগ অপসারণ করে ক্ষির গ্রহণ করা হয়। তেমনি ইন্দ্রিয়গণকে নিষ্ক্রিয় করে চৈতন্যের উদয় ঘটাতে হবে। চৈতন্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়গুলির মায়ারাজ্যের প্রভাব ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে শক্তিহীন হয়ে আসবে। পরে মৃতের ন্যায় শক্তিহীন হয়ে শরীরে অবস্থান করতে থাকবে।

সাধকের চিন্ময় অবস্থায় শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি মৃত অবস্থায় থাকার জন্য সাধনার এই অবস্থাকে জীয়ন্তে মরা বলা হয়েছে। এই অবস্থার উল্লেখ করে বাঁকাচাঁদ একটি পদে বললেন ঃ

যখন মনের মানুষ উদয় হবে,
ঘুচিবে মনের অন্ধকার, পথের বিবাদি যত,

সব হবে অনুগত, পলাবে রিপু যত করে
হুহুঙ্কার।

বুদ্ধদেব একটা উদাহরণের সাহায্যে এই অবস্থাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বললেন "ডিম্বের মধ্যে আবদ্ধ শিশু পক্ষী যেমন ঊর্ধ্ব আকাশের কল্পনা করতে পারে না, ডিম্ব-ভেদ করে নির্গত হলেই ঊর্ধ্ব অনন্ত আকাশের সন্ধান পায়। সেইরূপ মায়াণ্ড ভেদ না করা পর্য্যন্ত মানুষ অনন্ত চিদাকাশের ধারণা করতে পারে না"।

সহজিয়া সাধক চণ্ডীদাস একটি পদে বললেন ঃ

জীয়ন্তে মরিয়া যায়
তাহার মরণ জানে কোন জন
কেমন মরণ সেই
যে জনা জানয়ে সেই সে জীবয়ে
মরণ বাঁটিয়া লই। (অংশ বিশেষ)

কবীর বললেন—"মরতে যদি জান তবে জীয়ন্তে মর। ইহাই সার পথ। মরিতেছে সবাই। মরিতে মরিতে সবাই মরিবে। তবে যথাকালে আপন সাধনায় মরে কে ? জ্যান্তে না মরিলে দেহের মধ্যে ভগবানকে পাইবে না"।

বাউলরা সামাজিক হিসাবে মরে গেছে বলে মনে করে। মৃতের কাছে তো কোন সামাজিক দাবি চলে না। তাই বাউলদের সাধনার এক অঙ্গ হল জীয়ন্তে মরা।

সুফীদের মধ্যেও দিবানা (পাগল) নাম নিয়ে একদল সাধক সমাজের সব বাঁধন অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মধ্যেও ফিলা-ফনা বা জ্যান্তে মরা আছে।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ে ভক্তবৃন্দ সামাজিক নিয়ম বিধি অস্বীকার করেন না। জ্যান্তে মরা হয়ে তাঁরা সংযত, সৎ ও আদর্শ গৃহীরূপে সংসারী জীবন যাপন করেন। দুধ যতক্ষণ ভাল থাকে, ততক্ষণ সবই থাকে মিলে। কিন্তু দুধ নষ্ট হয়ে গেলে ছানা ও জল আলাদা হয়ে যায়। সেইরূপ সাধনা ও গৃহী জীবন আলাদা হয়ে গেলে সাধনা নষ্ট হয়ে গেছে বলে তাঁরা মনে করেন।

সংসারী জীবনে সতীমা ও দুলালচাঁদের (লালশশী) সাধনার উজ্জ্বল

জ্যোতিষ্কই তাঁদের সাধন জীবনে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা সঞ্চার করে। সেই আলোকেই তাঁরা এগিয়ে যান।

বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়, বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়, সুফী সম্প্রদায়, কিংবা বাউল সম্প্রদায়ের মত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভক্তগণ সংসার ত্যাগ করে ভিন্ন রংয়ের বসন ভূষণ ব্যবহার করেন না। ইঁহারা গুরুর নির্দেশে কঠোর সাধনা করেন গৃহস্থ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে। এজন্যই ইহাদের সাধন বিধি অন্যের কাছে অগোচর থেকে যায় এবং সাধক ভক্ত বলেও ইঁহাদের কোন পরিচিতি নাই।

(গ) প্রাণায়াম—যে বিদ্যার দ্বারা মানুষ প্রাণশক্তিকে ছন্দোমত স্পন্দিত করতে পারে, সেই বিদ্যার নাম প্রাণায়াম। ইহা যোগের প্রধান অঙ্গ। প্রাণায়াম সিদ্ধ হলে বিবেক জ্ঞানের সমস্ত আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

মানুষের শরীরে বাহাত্তর হাজার নাড়ী আছে। প্রাণায়াম প্রক্রিয়ায় ঐ সকল নাড়ীতে প্রাণ বায়ুকে চালনা করা হয়। এক এক নাড়ীতে এক এক প্রকার প্রক্রিয়ায় এই প্রাণবায়ু চলে। এইজন্য প্রাণায়ামও বাহাত্তর হাজার প্রকারের।

নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গীতে এবং নানা প্রকার শব্দতেও প্রাণায়াম হয়। কি প্রকার চেষ্টাতে কোন নাড়ীতে কি ভাবে প্রাণায়ামের ক্রিয়া হয়, লোকে তার সন্ধান জানে না। একমাত্র শিক্ষা গুরুর কাছে শিক্ষা করতে হয়। শাস্ত্রে এরূপ সংকেত আছে। শাস্ত্র দেখে ইহা অভ্যাস করতে গেলে দুরারোগ্য ব্যাধি কিংবা মৃত্যুও হতে পারে। এজন্য উপযুক্ত শিষ্য দেখেই শিক্ষাগুরু প্রাণায়াম দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন প্রকার প্রাণায়ামের মধ্যে পূরক প্রাণায়াম, রেচক প্রাণায়াম, কুম্ভক প্রাণায়াম ও পূর্ণ প্রাণায়াম উল্লেখযোগ্য।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ে অতি উচ্চ অংগের প্রাণায়াম সাধন বহুল ভাবে প্রসারিত ছিল। শিষ্যরা সাধনার পরাকাষ্ঠতা প্রদর্শন করে গুরুকে সন্তুষ্ট করে এই প্রাণায়াম শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এমনও দেখা যায় যে একজন চাকুরীজীবি গুরু তাঁর যোগ্য শিষ্য বৃন্দকে প্রাণায়াম বিদ্যা দান করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁরাই সাধক জীবনে চরম উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেছেন।

(ঘ) সখীভাব—ভগবানের রাজ্যে একমাত্র পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেখানে

পুরুষাভিমানী কোন ব্যক্তির প্রবেশের অধিকার নাই। পুরুষ প্রকৃতি স্বরূপতঃ প্রকৃতি স্বভাব বিশেষ। সে রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে সখী ভাবে আসতে হবে।

এ সত্য উদ্‌ঘাটন করলেন সাধিকা মীরাবাঈ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে জীব গোস্বামী প্রথমে মীরার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন কিন্তু সাধিকা মীরা যখন বলে পাঠালেন যে তিনি জানতেন, বৃন্দাবনে একটি মাত্রই পুরুষ আছেন এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণ আর সব তাঁর প্রকৃতি। আজ জানলেন সেখানে দ্বিতীয় পুরুষ আছেন। এই কথা শুনে সর্বত্যাগী বৈরাগী বলে অহমিকা রূপ মায়ার সূক্ষ্ম আবরণ টুকু জীব গোস্বামীকে এতদিন আবৃত করে রেখেছিল, এক্ষণে তা ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি সংশয় মুক্ত হন এবং সাদরে মীরাকে অভ্যর্থনা করেন।

জীবকে আত্মারূপে ভাবলে সেখানে পুরুষ প্রকৃতির পৃথক সত্তার কোন অস্তিত্ব থাকে না। কারণ আত্মা পুরুষ প্রকৃতি রূপে জোড়া। পরমেশ্বর আপন সৌন্দর্য্য ও রস সম্ভোগের জন্য এবং সৃষ্টির কামনায় আপন আত্মা দ্বিধা বিভক্ত করে পুরুষ প্রকৃতি রূপে দুই অঙ্গ বিশিষ্ট হলেন।

পরম সত্তার পুরুষ প্রকৃতি ভেদে দ্বিধা বিভক্তির ফলে সৃষ্টির ক্রম ধরে একদিকে যেমন বাহিরে পুরুষ ও প্রকৃতিকে ভিন্ন দেহে অবস্থান করতে দেখা যায়, অপর দিকে তেমনি প্রত্যেক মনুষ্য শরীরের অভ্যন্তরে পুরুষ প্রকৃতি রূপ উভয় সত্বাই বর্তমান থাকে। প্রত্যেক পুরুষের দেহাবরণের অন্তরালে প্রকৃতি ভাব এবং প্রত্যেক রমণীর দেহাভ্যন্তরে পুরুষ ভাব বিরাজ করে। প্রকৃতির গঠন প্রভাবে রমণীর মধ্যে অনুরাগ ও প্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত রূপে প্রকাশ পায়। তাদের হৃদয় নমনীয়তা ও কমনীয়তায় গঠিত হয়। কিন্তু পুরুষের পুরুষাভিমানের জন্য তার হৃদয় কমনীয়তা ও নমনীয়তা স্তিমিত হয়ে সূক্ষ্ম ভাবে বিরাজমান থাকে।

মায়ায় অভিভূত হয়ে পঞ্চভূতে গঠিত স্থূল শরীরকেই অহং মনে স্ফীত মানব ভ্রান্ত পথে চলে। স্বরূপ বিস্মৃত হয়। পুরুষাভিমান পরিত্যাগ করে রমণীর হৃদয়াবেগ যুক্ত অন্তর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাধনাই হল সখী ভাবের সাধনা। প্রেম নিবেদনের সাধনা।

সখী ভাবের সাধনায় বিন্দুকে অটল রাখার জন্য প্রয়োজন কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন, সত্যকথা বলা, জিতেন্দ্রিয় হওয়া, মন ও বাক্যে সংযম সাধন করা।

মাদক দ্রব্য, ডিম ও মাংস না খাওয়া, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা না করা। বৈরাগ্য অবলম্বনের দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে বাইরের আকর্ষণকে রুদ্ধ করে অন্তর্মুখী করার সাধনা করে তাঁকে অনুভব করার জন্য। গুরুর নির্দেশেই ভক্ত এ সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

সখীভাব বিনা ভগবানের রাজ্যে প্রবেশের কারও অধিকার নাই। খৃষ্ট ধর্মে এই মতের প্রভাব দেখা যায়। ডঃ ইং (Dr Inge) এর উদ্ধৃত সেন্ট জুয়ানের উক্তি

"I will draw near to thee in silence and wi!l uncover thy feet, that it may please thee to unite me to thyself. Make myself thy bride. I will rejoice in nothing till I am in thy arms."

আমি নীরবে তোমার দিকে অগ্রসর হব, তোমার চরণ পাদুকা মোচন করবো, যাহাতে তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার সহিত মিলিত কর। আমাকে তোমার বধূ কর। আমি যে পর্য্যন্ত তোমার আলিঙ্গন না লাভ করি, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই আনন্দিত হবো না।

পণ্ডিত নিউম্যান বলেছেন "If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must beeome a woman, yes however manly thau may be among men."

যদি তোমার আত্মা উচ্চ অধ্যাত্ম রাজ্যে নিত্যানন্দ ধামে প্রবেশ করতে চায়, তবে তাকে রমণী হতে হবে। মনুষ্য সমাজে যতই তোমার পুরুষাকারের গর্ব থাক, এখানে রমণী হওয়াই আবশ্যক।

মহাভাব স্বরূপিণী সতীমার সমীপে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা হল সখীভাবের সাধনার অনুবর্তী হওয়ার সাধনা, সতীমার কৃপালাভে ধন্য হওয়ার সাধনা, পরমপুরুষের দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করার সাধনা।

হরি বিরাজে নিরবধি হৃদি-সরোজে, তাতে
ভেদাভেদ আর সহচরি করবো কি বুঝে,
এ তনু প্রাণপণ সঁপেছি সে চরণে, জানিনে
ভাল মন্দ হরি বই।

—ভাবের গীত।

(ঙ) ভজন—লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যারা ইক্ষু-রসের পেয়েছে সন্ধান, অগ্রদিক হইতে ক্রমে
করে পান, তেমনি ভজনতত্ত্ব, ভজতে ভজতে
বুঝে পায় পরম পদার্থ, প্রভুর ভজন বিনা মিথ্যা
এ ছার জীবন ধারণ, লালশশীর বিধয় মিথ্যা
না হয় কাল ক্ষেপণ।

তিনি উপমার উল্লেখ করে বললেন, যেমন আঁকের ডগা ভাগে মিষ্ট রস থাকে না, রস হয় নোনতা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে গোড়ার দিকে এগোলেই মধুর রসের আস্বাদন করা যায়। তেমনি ভজনেও প্রথম প্রথম মন বসে না কিন্তু ছেদ না দিয়ে ভজন করলে পরিশেষে অমৃতের রসাস্বাদন করা যায়। অবশেষে সত্যেশ্বরের দর্শন লাভে ধন্য হয়।

তন্ত্রে মনুষ্য শরীরকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়েছে। "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।" অর্থাৎ যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে দেহ ভাণ্ডে। মানুষের দেহের মধ্যেই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর অবস্থান। শরীরের রহস্য অবগত হতে পারলেই নিজেকে চিনতে পারা যায় এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যার শরীর সেই বিশ্বেশ্বরের সহিত পরিচিত হওয়া যায়।

এই দেহের মধ্যে বিশ্বের পরিপূর্ণ লীলা। এই দেহের মধ্যেই সপ্ত সমুদ্র, ইহার মধ্যে নয় লক্ষ তারা, ইহার মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, এরই মধ্যে কুঞ্জ, নিকুঞ্জ বিরাজ করছে। এই দেহের মধ্যেই অসীমের অনন্ত ঐশ্বর্য্য থাকে থাকে শোভিত হয়ে রয়েছে। এক কথায় বলা যায় যে বাহির জগৎটা হল অন্তরের প্রতিচ্ছবি মাত্র।

বৈরাগী ভাবছে, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সবই বন্ধন। এই সব বন্ধন ছেড়ে বনে গিয়ে ভগবানকে পেতে হবে। তাই একদিন গভীর রাতে সে সব ছেড়ে চলল। ভগবান তাকে বার বার ফিরাতে চাইল। বললেন এই সবই আমি। তোমার মধ্যেও আমি। আমাকে খুঁজতে আর বনে যেতে হবে না।

তাই কবীর বললেন ঃ

কহৈঁ কবীর। বিছুড় নহিঁ মিলিহে
সো তরবর ছোড় বন ধাম রী।

তরুকে ছেড়ে যেমন বনকে পাওয়া যায় না, তেমনি সকলকে ছেড়ে আমাকে পাবে না।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন :

তুমি যার সহিতে ভারতে এসেছ বেড়াতে,
ছাড়াতে ভাই কিমতে পাড়বে হে তার
হাতে, গ্রন্থি বাঁধা অন্তরঙ্গ জনে, এখন আর
কি পুনঃ তারে হয় নাকো ভাই মনে, শশী
বলে ভজরে ভজরে ভাই সহজে।

তিনি ত দূরে নাই। জীবন তরির তিনিই ত মাঝি। অন্তরেই তিনি আছেন, অথচ অনন্ত ব্যবধান। অনন্ত ব্যবধান অতিক্রম করে অন্তরতম দেশে যে সহজ রূপী অন্তর্যামী বাস করছেন। তাঁর দর্শন লাভের জন্যই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনা, সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনা। নিজের শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে আত্মার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করার সাধনা। ইহাকেই বলে উল্টা সাধন বা সহজ ভজন।

বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়,
সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন :

তোমরা ভেবে দেখ ওরে ভাই সহজ বস্তু
কি, কৃষ্ণদাস তার করিয়ে নির্যাস
গ্রন্থে লিখলে কি, এবার সেই সহজের
অন্ত বুঝে সমজে দেখ ভাই, আনন্দ চিন্ময়
রস তার বাড়া আর নাই, এবার বেদ বিধি
পার, যে দেয় সাঁতার, যার হবে ভাই শুভদিন।

মানব শরীরের অভ্যন্তরে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী আছে। তার মধ্যে চতুর্দশটি প্রধান। ঐ চতুর্দশটির মধ্যে আবার পিঙ্গলা, ইড়া, সুষুম্মা, এই তিনটি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। এই সুষুম্মা নাড়ীর মূলাদেশে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা অবস্থায় রয়েছেন। তাঁকে জাগ্রত করলে চিন্ময়রূপ ধারণ করেন ও সুষুম্মার পথে অগ্রসর হয়ে সহস্রদল কমলে বিরাজিত সহজ মানুষের সাহিত মিলিত হন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন :

দেখ সেই রসে এক নিমিষে সৃষ্টি হচ্ছে যত,
উল্টাপাকে পড়িয়ে বিপাকে জীবে ঘুরছে অবিরত,
আছে এর উপর এক মহাজন মানুষ রতন, যিনি বীজের
বীজ সে রতন অমূল্য সে ধন, তারে হঠাৎ কারে
ধরতে নারে বিনা সৎসঙ্গ, সঙ্গ হলে রঙ্গ ধরিলে
দেয় নাকো ভঙ্গ, রাখে কায়দা করে নিমিকেরি
জোরে, অন্তপুরে হেরে সেই কিরণ, লালশশী বলে
নিমিকেরি জোরে অন্তপুরে হেরে সেই কিরণ।

মানুষ রতনকে ধরা যায় একমাত্র নির্মল প্রেমের সাধনায়। এ সম্বন্ধে একবার সাধক শ্রেষ্ঠ রবিদাসকে জিজ্ঞাসা করা হল, প্রেমের ধর্মে যদি বিকারেরই ভয়, তবে সে পথে যাব কেন ?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি খাও ?

উত্তর পেলেন—দুধ, দই, শাক, অন্ন খাই।

আবার প্রশ্ন হল—তা কি পচে ?

উত্তর এল—হাঁ।

রবিদাস বললেন—ইট, পাথর তো পচে না, তা কেন খাও না ?

উত্তর শুনলেন—তাতে যে প্রাণ বাঁচে না।

তখন রবিদাস বললেন, ঠিক সেই জন্যই প্রেমের পথে বিপদ থাকলেও সেই পথেই যেতে হবে। তা যে জীবন্ত। শুধু শুষ্ক আচারে, জ্ঞানে বিকারের ভয় না থাকলেও যাতে প্রাণ নাই, তাতে প্রাণ তো বাঁচে না। জীবন্ত মানুষ, জীবন্ত প্রেম ছাড়া বাঁচবে কেমন করে ?

কর্তাভজা সম্প্রদায়ে মানুষ ভজনের যোগ্য হওয়ার জন্য সাধনায় পর পর চারটি স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবর্তক স্তরে বিষয়াবদ্ধ মায়া মুগ্ধ মানুষ যখন গুরুর সমীপে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে উপনীত হয়, গুরু তাকে মন্ত্রবীজ

কর্ণকুহরে দান করেন। সেই মন্ত্রের সাধন করা, গুরুর উপদেশ শ্রবণ করা, তাঁর নির্দেশ মত জীবন পরিচালিত করা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা ও সাধুসঙ্গ করা ভক্ত জীবনে অবশ্য করণীয় বলে বিবেচিত হয়। গুরুর আশ্রিত হয়ে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণ করায় ভক্তের নিজের ইচ্ছা মত কোন কাজ করার আর অধিকার থাকে না। গুরুই ভক্তের জীবনতরি পরিচালনা করেন।

মন্ত্রবীজ আরোপের ফলে ভক্তের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার হয়, নামে নিষ্ঠা ও রুচি আসে, সাধুসঙ্গের প্রভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি জাগে, কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বনের ফলে ইন্দ্রিয়াদির চঞ্চলতা স্তিমিত হয়ে আসে, শ্বাসে শ্বাসে নাম স্মরণ করার ফলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে আসে। শুদ্ধ ভাবে ও ভক্তিতে তন্ময় হয়ে থাকে। এই সাধনে সফলতা লাভ করলে ভক্ত তখন প্রবর্তক স্তর অতিক্রম করে সাধন স্তরে উপনীত হন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন:

ভাই ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে ক্ষমা যে দিয়েছে,
নিষ্কামী হইয়ে যেচে যেচে সে প্রেমরসে
মজেছে, সেই কামনার অতীত প্রেম এমনি
কি হবে, নিষ্কাম হইবে তবে রসে পশিবে,
মর্মেতে যে প্রেম উপজে, দেখ ভাই
আপগরজিরে তাহাতে মজে, আর সহজ বিনে
সহজ প্রেমের ধার বা কে ধারে।

গুরুর আশ্রয়ে জীয়ন্তে মরা হওয়ার সাধনা করতে থাকেন। সাধনার ফলে মনের একাগ্রতা জাগ্রত হয়। মনের গতি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠে। তখন মনকে প্রেমরস সাধনার প্রতি আকৃষ্ট করা হয়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন:

মন তেতো কিংবা মিঠে খাটা চেকেও
চাকলি না, পুঁজি পাটা সকল হারালি
তার যত্ন জানলি না, বল্লি যা তা করে
বসলি কি, এই বেলাতে বলরে বাকীর
দায়ে ঠেকেছি, আর তোর কয়েদে থেকে

আমার গেলরে সর্বস্ব ধন, বইছো কি
ভূতের বোঝা ওরে আমার মন।

সাধক তখন মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে প্রেমরসের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

মানব শরীরের পূর্বদিকে অমৃতবহা নাড়ী ইড়া, পশ্চিম দিকে বিষবহা নাড়ী পিঙ্গলা, উত্তরে সহস্রদল পদ্মে অধিষ্ঠিত পরমপুরুষ—মানুষরতন, দক্ষিণে দেহরতি অবস্থিত। একই রতি বা বিন্দুতে কাম ও প্রেম উভয়ই অবস্থান করে। স্বরূপতঃ উভয় এক হলেও একটি মলিন এবং অপরটি নির্মল।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

সহজ সুরসের কথা শুধালে তুমি, শুনিয়ে
সেই রসের ঘরে পাথারে ভাসতেছি আমি,
দেখ দুই নালাতে জগৎ ভাসে এ বলে কে
মানে, দেখিয়ে না দেখে যেন অন্ধ নয়নে, আর
বলবো কি ভাই প্রসঙ্গটি রঙ্গে ভাসে অনুক্ষণ।

বিন্দুর ক্ষয় হলে চিত্ত মালিন্য যুক্ত হয়। ভাব স্থায়ী হয় না। ভাব স্থায়ী না হলে প্রেম জন্মায় না। এজন্য এরূপ সাবধান বাণী প্রচলিত আছে।

রাঁধুনি হইবি, ব্যাঞ্জন বাঁটিবি
হাঁড়ি না ছুঁইবি তায়
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
সাপ না গিলিবে তায়
অমিয় সাগরে সিনান করিবি
কেশ না ভিজিবে তায়
মাকড়সার জালে হাতীরে বাঁধিবি
পীরিতি মিলিবে তায়।

প্রকৃত কামকে অকাম করার জন্য অটলবীর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রস সাধনায় অগ্রসর হয়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

বইছ কি ভূতের বোঝা ওরে আমার মন, এমন
জহর মাণিক বোঝাই করে লাভ করেছ তাঁবার

কোণ, পেয়েছ কোন রসের আস্বাদন, সে
রসের তুই ভিয়ান জানলি না, রসের নদীর
তটে বসে বিরস ঘুচলো না।

সামর্থারতিসম্পন্না সাধিকা সাধন সঙ্গিনীর সহিত অনুরাগের অনুশীলন হতে একদিকে যেমন ভাবদেহ ক্রমশ অভিব্যক্ত হতে থাকে, অপর দিকে তেমনি অটল বিন্দু স্কন্ধ হয়ে ইড়া পিঙ্গলার পথে ভিয়ান হয়ে প্রাকৃত রতি অপ্রাকৃত রসে পরিণত হয়। পরে প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে কামগন্ধ হীন হয়।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যাদের ঐ রসিককে পাব ভেবে হচ্ছে ভাবনা
কাম সাগরে বারে বারে কচ্ছে কামনা, মনের
আশা ছিল পূর্ণ হল মন মজিল হেরিয়ে।

সাধন সঙ্গিনীর সঙ্গে অনুরাগের অনুশীলন করার ফলে সাধকের দেহস্থিত প্রকৃতি ভাবের স্ফুরণ হতে থাকে। প্রকৃতি ভাবে ভাবিত হলে তখন আর সাধন সঙ্গিনীর প্রয়োজন থাকে না। সাধক নিজেই প্রকৃতি ভাবে সাধনায় অগ্রসর হতে থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বিভাব আর থাকে না। তখন উভয়ই একই আত্মা, ভিন্নরূপ বলে মনে করেন।

ইড়া পিঙ্গলার মুখদ্বয় সংযুক্ত হওয়ায় সুষুম্নার দ্বার উন্মুক্ত হয়। তখন কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে চিন্ময়ী রূপ ধারণ করেন। সুষুম্নার মধ্য দিয়ে ঊর্ধগতিতে একটির পর একটি পদ্ম অতিক্রম করে সহস্রার দিকে অগ্রসর হন।

চিৎশক্তির জাগরণের ফলে অবিদ্যার আবরণ খসে পড়ে। দেহআভিমান লুপ্ত হয়। আত্মার অজ্ঞানতার ঘোর কেটে যায়। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বাকে সিদ্ধ অবস্থা বলা হয়। রসিক নামেও অভিহিত হন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

দেখ জনমে জনমে এত পরিশ্রম প্রাণপণে,
ক্ষমা নাইক গমনাগমনে ভাই যাহার কারণে,
দেখ আজ নাগাদি তা তো কেউ বুঝলে নারে ভাই,
গরজে আর গরজি হয়ে মজলগে সবাই, প্রেমী

বিনে মর্ম কে জানে, অমনি কে মনের কথা
আনবে হে টেনে, আর শশী বলে রসিক হলে
রস বিচারে।

সিদ্ধ অবস্থায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সাধক প্রকৃতিই হ্লাদিনী স্বরূপে প্রেমের সাধনা করেন। প্রেম সাধনায় সিদ্ধ হলে সিদ্ধের সিদ্ধ রূপে পরিগণিত হন। তখন সাধক নিত্যধামে প্রবেশ করেন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যখন ভাবীর সঙ্গে সেই স্ব-অঙ্গে অভেদ
অঙ্গ ভাবিবে, অমনি অমিয় সাগর সেই
নাগর বাধ্য হইবে।

জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদত্ব অনুভব করেন। সহজ মানুষের মোহন মূর্তি দর্শন লাভে মানব জীবন সফল করেন।

উপনিষদের যুগ হতে ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে এই উল্টা সাধনের ধারা প্রবহমান রয়েছে।

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস তাঁর "প্রেমিক গুরু" পুস্তকে কর্তাভজা ও অন্যান্য শাখা বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে আলোচনার শেষে বললেন ঃ

…কিরূপ নরনারী ইহাদের সম্প্রদায়ের সাধনার অধিকারী? তাহারা বলেন ঃ

মেয়ে হিজরে পুরুষ খোজা,
তবে হবে কর্তাভজা।

পাঠক! দেখিলে এই সকল সম্প্রদায়ের সাধন পন্থাগুলি কিরূপ ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। এখন পাশব প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব যদি অনধিকারী হইয়া সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করত ঃ তাহা কলুষিত করিয়া ফেলে, তজ্জন্য তাহাদিগের সাধন পন্থাগুলিকে কেহই অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইবে না। অধিকারী হইয়া যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য।"

পরিশেষে ইহা বলা যায় যে লালশশী সাধনার ক্রিয়া ও পথ নির্দেশক স্বরূপ অসংখ্য পদ রচনা করেছেন সন্ধ্যাভাষায়। শব্দার্থ ভাবধারার অনুবর্তী হয়ে মাত্র কয়েকটি পদের অংশ বিশেষ সাধনার স্তর অনুসারে এখানে উল্লেখ করা হল।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি অতি গোপনে ও সকলের অলক্ষ্যে গুরু শিষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এজন্য অনেকেই এই সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি জানতে পারেন না। এই না জানার কারণেই অনেকে এই সম্প্রদায়ের ধর্মকে গুপ্তধর্ম নামে অভিহিত করে থাকেন।

কেহ যদি আত্ম বিজ্ঞ মনে করে ও সাধনার স্তরে উন্নীত না হয়ে এরূপ সাধনায় ব্রতী হয়, তাহলে সে তো অকৃতকার্য্য হইবেই পরন্তু নিজেরও সর্বনাশ করবে। তাদের এই হীন প্রচেষ্টার দরুন ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সম্মান ক্ষুণ্ন হয় ও সাধারণের নিকট উহা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

হিন্দু মুসলমানের সহ অবস্থান—বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু মুসলমান একই আসনে বসে ধর্ম সাধনা করছেন এ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। একমাত্র কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। এ দৃষ্টান্ত অপর সহজিয়া সম্প্রদায়েও পরিলক্ষিত হয়। কর্তাভজা সম্প্রদায়সহ অপর সহজিয়া সম্প্রদায়গুলি মানুষের উপাসনা করেন। মনের মানুষ—মানুষ রতনের দর্শন অভিলাষী হয়েই এই সাধনা।

বিশেষ কোন ধর্মমত যাজন করলে শ্রেণী ভেদের উদ্ভব হয়। পরস্পর পরস্পরের সহিত বিরোধিতার আশঙ্কা থাকে। ঘোষপাড়া ঠাকুরবাড়ীর উপাস্য দেবতা হল মানুষ। 'মানুষ' এই নামে কোন বিভিন্নতা নাই। সকল মানুষই একই আকার বিশিষ্ট ও রক্ত, অস্থি, মজ্জা সমন্বিত। মানসিক মায়া, মমতা, সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তিও অভিন্ন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

ভাইরে মগ ফিরিঙ্গি, ওলন্দাজ, হিন্দু
মুসলমান, এক বিধাতায় গড়েছে,
বস্তুতায় আছে, সব দেহে সমান, দেখ
ছত্রিশ বর্ণ সকলকে মানুষ বলে কয়,
গ্রন্থকালে লিখলে ধরে মানুষ একটি হয়,
যদি এক অংশেতে জনম হলো সকল,
আসল নকল বলি তবে কারে।

হিন্দু মুসলমান সহ জগতের বিভিন্ন জাতি একই অংশ হতে উদ্ভূত হয়ে মানুষ রূপে জীবন যাপন করছেন। এর মধ্যে কেহ নকল নয়। সকলেই আসল, অমৃতের সন্তান। ঘোষপাড়া ঠাকুরবাড়ীতে হিন্দু ও মুসলমানকে সম্প্রদায়গত ভাবে চিন্তা করা হয় না। বাহিরের আচারই হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

সাধক দাদু বললেন ঃ

না তহাঁ হিন্দু দেহুরা ন তহাঁ তুরুক মসীতি
দাদু আপৈ আপ হৈ নহীঁ তহাঁ রহ রীতি

ভগবানের রাজ্যে হিন্দুর দেবালয় নাই, মুসলমানের মসজিদও নাই। দাদু বলেন, সেখানে তিনি আপনি বিরাজিত। সেখানে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই।

ঘোষপাড়া ঠাকুরবাড়ীতে মানুষ পূজারীর সম্মেলন। সেখানে সম্প্রদায়গত কোন বিভেদ স্বীকার করা হয় না। সাম্প্রদায়িকতার কোন স্বীকৃতিও নাই। উভয় সম্প্রদায় একই আসনে বসে সাধন ভজন করেন। একই পংক্তিতে বসে উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ আনন্দিত চিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন। কোন স্পর্শদোষ মানেন না। হিন্দু মুসলমানের মিলনের বাধা স্বরূপ কোন বর্ণ বৈষম্য কিংবা বাহ্য আচার তাঁরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ধর্মাচরণের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেন।

সম্প্রদায়ী ভক্তবৃন্দ জাতিভেদ মানেন না কিন্তু তারা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে পুত্র কন্যাদির বিবাহ কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু শুভানুষ্ঠানে ধর্ম নিষিদ্ধ মদ মাংস গ্রহণ করেন না।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

তার ভব-সিন্ধু হে বন্ধু হিন্দু মুসলমান, স্বর্গ
মর্ত্ত্য পাতাল উর্দ্ধ অধঃ এ চৌদ্দক্ষেত্রে সবে জানে,
ক্রমে তোমার নামের মহিমা ক্রমে শুনতে পাই,
ক্রমে সবে তরিবে নামের গৌরবে ভবে চিন্তা নাই।

প্রেমের অনুরোধে উভয় উভয়ের নিকট বন্ধন স্বীকার করলেন। কারণ

উভয় উভয়ের মিলিত সত্ত্বাই হল পূর্ণসত্ত্বা। পূর্ণসত্ত্বা না হলে পূর্ণানন্দের উপাসনা হয় না। নিত্যধামে যাওয়ার সুযোগও মেলে না।

এই ভাবধারার অনুরূপ ভাবধারা মধ্যযুগেও প্রসারিত ছিল।

সাধক দাদু বললেন ঃ

দুন্ঁ্য হাথী হৈব রহে, মিলি রস পিয়া ন জাই।

হিন্দু মুসলমান দুই হাত। দুই হাত একত্র না হলে কেমন করে অমৃতের অঞ্জলি রচিত হবে। কেমন করে অমৃত রস পান করা যাবে।

৯৭৩ খৃষ্টাব্দে মরক্কো দেশে সুফী সাধক অবু-অল-আলা মু-অররী শাস্ত্র-পন্থীদের কঠোর সমালোচনা করে বললেন—পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছ বলে তো গর্ব কর? ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তুমি নিজে কত বড় পৌত্তলিক? বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ গ্রন্থ, বিশেষ ভাষা, বিশেষ দেশ, বিশেষ দিন ও বিশেষ দিককেই যদি একমাত্র পবিত্র মানো, তবে তাহাও তো পৌত্তলিকতা। দেব পূজা ছেড়ে দেবালয়ে অর্থাৎ মশজিদেরই পূজা যদি কর তবেই বা কম পৌত্তলিকতা কি?"

হিন্দু মুসলমানকে মিলাতে চেয়েছিলেন সুফী সাধক কবীর। ফলে দুদলই তার নামে বাদশার কাছে নালিশ করলে দরবারে তার তলব হল। একই অভিযোক্তার কাঠগড়ায় মোল্লা ও পন্ডীতদের একসঙ্গে দেখে তিনি বলেছিলেন—"হায়, এটাই-তো আমি চেয়েছিলাম, তবে তোমরা ভুল করলে কেন? বিশ্ব বিধাতার সিংহাসনের তলে মিলিত হবার জন্য তোমাদের ডেকেছিলাম। সেখানে তোমাদের মিলবার স্থান কুলালো না, আর কুলালো এই পৃথিবীর রাজার সিংহাসনের নীচে? বিধাতার সিংহাসনের তলার স্থান কি এখানকার স্থান হতে সংকীর্ণ? মিলাতে চেয়ে ছিলাম প্রেমে, ভক্তিতে আর তোমরা আজ মিলেছ বিদ্বেষে! বিদ্বেষ হতে কি প্রেম, ভক্তির স্থান প্রশস্ত নয়? সেই প্রশস্ত স্থান পন্ডিত মোল্লাদের চোখে পড়লো না, পড়লো নিরক্ষর ভক্তের চোখে।"

সাধক রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন আচার পন্থী ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁর শিষ্য ছিলেন জোলা কবীর, মুচি রবিদাস, নাপিত সেনা, জাঠ বন্না প্রভৃতি। তিনি নারীকেও দিক্ষা দিতেন। তাঁর শিষ্যা পীপা ছিলেন রাজপুত।

ঘোষপাড়া ঠাকুরবাড়ীতে একই আদর্শ লক্ষিত হয়। এখানেও হিন্দু গুরুর শিষ্য মুসলমান, মুসলমান গুরুর শিষ্য হিন্দু। জাতিগত চিন্তাধারার

চিহ্ন মাত্র নাই। নিরক্ষর হিন্দু মুসলমান মিলিত হতে পেরেছিলেন কেবল প্রীতি ও ভক্তির প্রভাবে। কিন্তু আভিজাত্য ও পান্ডিত্যের অভিমানের জন্যই বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁরা মিলিত করতে পারেন নাই।

সত্য পন্ডিত কে? এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে সুফী সাধক রজ্জবজী বললেন— "বিশ্বই যথার্থ ধর্মশাস্ত্র। পন্ডিত, কাজীর দল কাগজে লেখা ধর্মশাস্ত্র লইয়াই মরেন। বিধাতার নিত্য নবীন জীবন্ত এই ধর্মশাস্ত্র তাঁহারা দেখেন না। আমাদের অন্তরের কাগজে প্রভু নিত্যই তাঁহার ধর্মশাস্ত্র লিখিতেছেন। তাহা কেউ চাহিয়া দেখেন নাই। মানব ইতিহাসে তাঁহার অখন্ড বেদ উচ্চারিত। বাইরের ঝুটা আলো নিবাইয়া দিয়া সেই বেদ কোরান পড়। হিন্দু মুসলমান সেই প্রাণপুস্তক পড়িয়া দেখ। সর্বত্র তবে দেখিবে একই বিদ্যা। যে তাহা পড়িয়াছে, সেই সত্য পন্ডিত।"

তীর্থক্ষেত্রে সাজান দেব মূর্তি দর্শন করে কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না বরং পরিশ্রমের সীমা থাকে না। যে সম্প্রদায়ে কায়া সাধন একমাত্র লক্ষ্য এবং কায়ার মধ্যেই সহজ মানুষের দর্শন লাভে আগ্রহী, সেখানে বাহ্যিক দর্শনে মন সরে না।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

লোক তীর্থযাত্রা পরিশ্রম করছে যেন ভ্রমে,
সঙ্গ পেয়ে রঙ্গ না বুঝিয়ে তোমার কাজ কি
পরিশ্রমে, হয়ে নিত্যানন্দ চিতে, অন্য চিন্তা
হতে, যখন ভাই ক্ষান্ত হয়ে বসিবে, অমনি
তখনি মনের ভ্রান্তি ঘুচিবে।

সুফী সাধক কবীর বললেন :

মো কো কহাঁ ঢুঁড়ো বন্দে
মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ
না কাবে কৈলাস মেঁ

ভগবান বলেন, আমাকে কেন বৃথা বাহিরে খুঁজিয়া মরিস? আমি তো

তোর পাশেই আছি। আমি না থাকি দেবালয়ে, না থাকি মসজিদে, না থাকি কাবায়, না কৈলাসে আমার স্থান।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ে হিন্দু মুসলমানের মিলনের ফলে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু শব্দের পরিবর্তন দেখা যায়। ভাবের গীতে অনেক পদে লালশশী ঈশ্বর শব্দের পরিবর্তে মালিক, খোদা, কৃপার পরিবর্তে মর্জি, দীনের ঈশ্বর পরিবর্তে রব্য রবু ইত্যাদি পরিবর্তক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। এ ছাড়া শুক্রবারেই ভাবের গীত কীর্তন ও পূজার দিন ধার্য্য করা হয় যাহা মুসলমানদের পবিত্র নমাজের দিন। চিড়া, মুড়কী দই কলা ইত্যাদি সহযোগে নিবেদিত বস্তুকে বলা হয় গঞ্জ ভোগ। উহাই প্রদত্ত হয় রমজান মাসে, বলা হয় এফতারি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জাতি ভেদের সংকীর্ণতা ভেঙ্গে দিয়ে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে—তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।' এদের মধ্যে একজনের নাম হরিদাস। অপর দুজনের নাম সাকর মল্লিক ও দবীর খান। শেষোক্ত দুজনের নাম হয় বর্ণ হিন্দুর পরিচয়ে সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী। কিন্তু কর্তাভজা সম্প্রদায়ে মুসলমান ভক্তদের দীক্ষান্তে নাম পরিবর্তন হয় না বরং নিজ নামেই হিন্দু ভক্তদের সহিত মেলামেশা করেন।

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মাহাত্মা গুরু নানক হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তকেই শিষ্যত্ব দান করেছিলেন।

উভয় সম্প্রদায়ের আকাঙ্খিত বস্তু একই, তা হল ঈশ্বরকে পাওয়া। এ সত্য উপলব্ধি করেই উভয় সম্প্রদায় একে অন্যের সহিত সহজেই মিলিত হতে পেরেছিলেন। এ মিলন সহজজাত। এজন্য কর্তাভজা সম্প্রদায়ে হিন্দু মুসলমানের সহ অবস্থান ও সাধনার এক উজ্জ্বল আদর্শ রূপে শোভিত হয়ে রয়েছে ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে।

সাহিত্য—তখনকার দিনে কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। সেই রাজধানীর সন্নিকটে পল্লীগ্রাম ঘোষপাড়া হতে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রচার সুরু হল। প্রচারিত হল—'সকল ধর্ম সত্য—সকল আচার সত্য, গুরু সত্য-সত্যই ভগবান।" প্রচার সুদূর গ্রামবাংলায় গিয়ে পৌঁছিল।

অগণিত ভক্ত জনসাধারণের সতীমার ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত সুরু হল। ঠাকুরবাড়ী হতে সতীমা কর্তৃক প্রচারিত সত্য ধর্মের আচার, ব্যবহার, সাধন, ভজন পদ্ধতির মধ্যে ভাগবত ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, তন্ত্র ও সহজিয়া ভাবধারায় মিলিত এক রূপান্তরিত নব প্রকাশ বলে পরিলক্ষিত হল। সর্ব ধর্ম-সমন্বয়-রূপ কর্তাভজন ধর্ম ভক্ত সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করলো।

সহজিয়া মনোভাবী বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তবৃন্দ, লুইপাদ প্রবর্তিত বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের ভক্তবৃন্দ, সুফী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মুসলমান ভক্তবৃন্দ, হিন্দু সমাজের নিপীড়িত ও অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ভক্তবৃন্দ, এবং কর্তাভজা ধর্মাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বর্ণ হিন্দুগণ দলে দলে ঘোষপাড়া সতীমার-ঠাকুরবাড়ীতে এসে সত্যধর্মে দীক্ষিত হতে লাগলেন। অবিভক্ত বাংলার সুদূর গ্রাম গঞ্জে সত্য ধর্মের বিস্তার লাভ করলো। দোল উৎসব ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান হতে ভক্তবৃন্দ দলে দলে আসতে থাকায় এক বিরাট ভক্ত সমাবেশের সৃষ্টি হল। দিনে দিনে ভক্ত সংখ্যা স্ফীত হতে লাগলো। সর্বধর্মের ভক্তবৃন্দের সমাবেশের ফলে সকলে একই সম্প্রদায়ভুক্ত ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় ঘোষপাড়া ঠাকুরবাড়ী "মানুষ মিলন ক্ষেত্র" রূপ পরিগ্রহ করিল।

কলকাতার সুধী সমাজ প্রথমে ঔদাসীন্য প্রকাশ করতে লাগলেন। নিছক একদল নীচ জাতীয় লোকের কোলাহল বলে মনে করলেন।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন :

পাগলে পাগলে কোলাহল, লোকে বলে এরা
কি করে গণ্ডগোল, এর ভাব বুঝিতে পারে না
কেউ শুনে লাগে চমৎকার।

ধর্মের বিস্তৃতি ও আলৌকিক মহিমান্বিত কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকায় সুধী সমাজের দৃষ্টি ঘোষপাড়া ঠাকুরবাড়ীর প্রতি আকৃষ্ট হল। তখন তাঁরা যাতায়াত সুরু করলেন প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য। এলেন কেরী, মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড ও অন্যান্য বাঙ্গালী সুধীবৃন্দ। ঠাকুরবাড়ীতে এসে আলাপ আলোচনা ও ভক্ত মিলন প্রত্যক্ষ করে তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করলেন। অক্ষয় কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, নবীনচন্দ্র সেনের আমার জীবন, গণেশ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী সংগ্রহ, দীনেশচন্দ্র সেনের

বৃহৎ বঙ্গ ও বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, নগেন্দ্র নাথ বসুর বিশ্বকোষ, স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের প্রেমিকগুরু পুস্তকে বিক্ষিপ্ত ভাবে ধর্ম নেতাগণের জীবনী ও ধর্মের রীতিনীতি সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশিত হল। ঘোষপাড়ার সাহিত্যেরও সূচনা হল। এঁনারা প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় রহিলেন। এ কার্যে অন্যান্য সুধীবৃন্দ সচেষ্ট হলেন।

অপর দিকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিকৃত ও নিন্দা বাচক বিবরণীও প্রকাশিত হতে লাগলো সোমপ্রকাশ, সংবাদ প্রভাকর ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে। এই নিন্দাধারার সহিত যুক্ত হল দাশরথি রায়ের পাঁচালী। একদিকে নিন্দাবাদ আর এক দিকে প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করার সদ্ প্রচেষ্টা একই সঙ্গে চলতে লাগলো।

ঠাকুরবাড়ীর নিন্দাবাদ প্রচারে গিরীশবাবু আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কর্তাভজাদের রীতি নীতির প্রতি মনে মনে বিরক্তও হয়েছিলেন। একদিন কর্তাভজাদের সম্বন্ধে কথা উঠতে গিরীশ বাবু শ্লেষ প্রকাশ করে বলেন—"আমি উহাদের সম্বন্ধে একটা নাটক লিখবো।" গিরীশ বাবুর এরূপ কথা শুনে ঠাকুর গম্ভীর ভাব ধারণ করেন এবং বলেন—"দেখ ইঁহাদের মধ্যেও অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেছেন। এ-ও একটা পথ।" এই কথা শুনে গিরীশ বাবু নাটক রচনা হতে বিরত হলেন।

ঠাকুরবাড়ীর ভক্তগণও নীরব দর্শক হয়ে রইলেন না। নিন্দাবাদের কোন প্রতিবাদ করা হল না কিন্তু তাঁরা তাঁদের উপলব্ধির পরিপেক্ষিতে ঠাকুরবাড়ীর ধর্ম সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রকাশ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলেন।

মনুলাল মিশ্র প্রকাশ করলেন—সহজতত্ত্ব প্রকাশ ১৩৩২ সালে। তার পর প্রকাশ করলেন—ভাবের গীতের ব্যাখ্যা ১৩৩৫ সালে। এরপর প্রকাশিত হল সত্যধর্ম উপাসনা, সতীমার মাহাত্ম কথা, ভজনতত্ত্ব গীত, দুলাল চাঁদের সার উপদেশ, ভাব লহরী, তন্ত্র রত্নোদ্ধার এবং কল্পনাপ্রসূত সতীমার ভাবমূর্তি ছবি। পঞ্চানন অধিকারী রচিত নিত্যধাম ঘোষপাড়ার আদিবৃত্তান্ত প্রকাশিত হল ১৩৪০ সালে। দেবেন্দ্রনাথ দে রচিত কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হল ১৩৬২ সালে। পরিশেষে লেখকের রচিত 'ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়' নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হল ১৩৯০ সালে।

পূর্বকালের নিন্দাবাদের ধারক ও বাহক রূপে বিকৃত তথ্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করার প্রবণতা ইদানিং কালেও কিছু কিছু পুস্তকের মধ্যে

প্রতিফলন হতে দেখা যায় তথাপি বহু সুধীবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে অত্যন্ত সচেষ্ট হয়ে রয়েছেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রকৃত তথ্য সমন্বিত ইতিহাস প্রণয়ন করার জন্য। তাঁদের এ সদ্ প্রচেষ্টা সাফল্য মন্ডিত হবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই ভাবেই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাহিত্য ভান্ডার ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

সঙ্গীত—ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায় হল সত্য দর্শন সাধনার সাধক সম্প্রদায়। দুলাল চাঁদ পাল ওরফে লালশশী ছিলেন এ সম্প্রদায়ে পরম পুরুষ। তিনি কর্তাভজা সম্প্রদায়েরও রূপকার। তিনি এই সাধনার পদ্ধতি ও রীতি নীতি প্রকাশ করার জন্য যে ভাষার ব্যবহার করেছিলেন, তারও একটা প্রহেলিকাময় বৈশিষ্ট ছিল। অশ্রদ্ধাশীল সাধারণ ব্যক্তি যাতে সাধকগণের-সাধনার গূঢ়তত্ব অবগত হতে না পারে, এইজন্যই এই জাতীয় প্রহেলিকাময় ভাষার ব্যবহার। এই ভাষাকে বলা হয় সন্ধ্যাভাষা।

ঠিক সন্ধ্যাভাষার প্রয়োগ বহুল ভাবে দেখতে পাওয়া যায় তান্ত্রিক শাস্ত্রে, বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের চর্য্যাগীতিতে এবং চন্ডীদাসের সাধন বিষয়ক পদাবলীতে। এর পর লালশশীর রচিত ভাবের গীতে। ভাবের গীত হল সত্য সুন্দরের উপলব্ধির এক ভাবের বন্যা।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

যে নিধি ভাবের স্বরূপ, কদাচিৎ হয় না
ভাবে বিরূপ, ভাবের বন্ধু ভাবের সিন্ধু
সদানন্দ সুধাময়, ত্রিকূলে তারে সকলে
বলে রসময়, দেখ রসিক নাগর রসের
গাগর রসের সাগর যেই, চিন্তা করি চিনতে
পারি চিন্তামণি সেই।

ভাবের গীতের অন্তর্ভুক্ত পদগুলির ভাবধারা যাতে সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতে না পারে, এজন্যই প্রহেলিকাময় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। একমাত্র ভাবীজনাই গুরু কৃপায় সন্ধ্যাভাষায় রচিত ভাবের গীতের পদগুলির মর্মার্থ উপলব্ধি করে সাধন পথে অগ্রসর হতে পারেন। সন্ধ্যাভাষার প্রকৃতিই হল

বিশেষ বিশেষ শব্দের উপর বিশেষ বিশেষ অর্থ আরোপ করা। এজন্যই সাধারণের পক্ষে পদের যথার্থ মর্মার্থ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না।

সন্ধ্যাভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকজন সুধীবৃন্দের সুচিন্তিত অভিমত এখানে তুলে ধরা হল।

রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—"সহজিয়াদের অনেক কথাই সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত, এই ভাষাভিজ্ঞ ভিন্ন কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। শব্দের সাধারণ যে অর্থ, অনেক সময় সন্ধ্যাভাষায় তাহা ভিন্নার্থবোধক। সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে তাহারা সে সকল কুট অর্থ কাহাকেও বলিবে না। সমস্ত অর্থ ও সমাজের সংস্কারগুলি পদদলিত করিয়া যে সকল মত অসামান্য মৌলিকতা দেখাইয়া অতিরিক্ত সাহসিকতার সহিত কথিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ লোক শুনিলে বিদ্রোহী হইবে এজন্য সহজিয়ারা সন্ধ্যাভাষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "সে দেশের কথা, এ দেশে কহিলে, লাগিবে মরমে ব্যথা।"—চন্ডীদাস।

দৃষ্টান্ত স্থলে আমার বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ে ১৮৩৪-৫০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত লাল শশীর গানের উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল গানের ভাষা অতি সহজ বাঙ্গালা কিন্তু ইহাদের ভাব এত জটিল যে আমরা মাথা খুঁড়িয়া অনেকগুলির কোন অর্থ করিতে পারি নাই। সহজিয়া সাহিত্য বাঙ্গালার জনসাধারণের নিজস্ব। এই সাহিত্যে হিন্দু দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, এবং মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের মত ও তাহাদের আনুষ্ঠানিক সাধনা সহজ ভাষায় কিন্তু অতি জটিল ভাবের সঙ্কেতের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।"

শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেন-"আমরা দেখিয়াছি প্রাচীন ও মধ্যযুগে অনেক সাধক সম্প্রদায়ই ছিলেন কোনও বিশেষ গুহ্য সাধনার সাধক। এই গুহ্য সাধনার পদ্ধতি ও অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহারও একটা প্রহেলিকাময় বৈশিষ্ট ছিল। অশ্রদ্ধাশীল সাধারণ লোকগণ যাহাতে সাধকগণের সাধনার গূঢ়তত্ত্ব অবগত না হইতে পারে, এই জন্যই এই জাতীয় প্রহেলিকাময় ভাষার ব্যবহার। পরে অবশ্য ইহা মধ্যযুগে একটা সাহিত্যিক রীতিরূপেই দেখা দিয়াছিল। প্রাচীন ও মধ্য যুগে সাহিত্যের এই প্রহেলিকা ভাষা সাধারণতঃ সন্ধ্যাভাষা বলিয়া খ্যাত।

আসল অর্থকে আরও মহিমান্বিত এবং যত্নগ্রাহ্য করিয়া তুলিবার জন্য এই

যে প্রহেলিকা ভাষার ব্যবহার, ঋগ্‌বেদ এবং অথর্ববেদের বহু স্থানে ইহার নমুনা পাওয়া যায়। ঠিক সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার আমরা বহুলভাবে দেখিতে পাই তান্ত্রিক শাস্ত্রের ক্রম বিকাশের সঙ্গে। তন্ত্রের সাধনা অনেকাংশে গূঢ় এবং গুহ্য। এই সাধনা সাধারণ লোকের হাতে পড়িয়া কোনও বিকৃতি লাভ না করে এই জন্যই পারিভাষিক সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার। সন্ধ্যাভাষার বৈশিষ্ট হল এখানে মাঝে মাঝে এমন বর্ণনা দেখিতে পাই, যাহার আক্ষরিক ভাবে এক অর্থ, যোগ সাধনার দিক হইতে সম্পূর্ণ আর এক অর্থ।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—'আলো আঁধারি ভাষা কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না।

মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেন—"ভাষাটি মূলে সন্ধ্যাভাষা নয়, ইহা হইল সন্ধাভাষা (সম্+ধা) অর্থাৎ একটি বিশেষ অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় লইয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে যে ভাষা। এখানে যে কথাটি বলা হয় তাহার বাইরের একটা সাধারণ অর্থ আছে, আবার ভিতরে একটি গূঢ় অর্থের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে।...আমার মনে হয় সন্ধাভাষা কথাটিই পরবর্তীকালে আভিপ্রায়িক অর্থ হতে অস্পষ্ট আলো আঁধারি ভাষার একটা অর্থই গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই ভাবেই সন্ধাভাষা সন্ধ্যাভাষায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।"

বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, মন্ত্র, গীতা, ভাগবত ও সহজিয়া ভাব ধারার নির্যাস সঙ্গীতের সুরের মূর্ছনায় সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থ ভাবের গীতে। ভাবের গীত আখ্যান গ্রন্থ নয়, তত্ত্ব গ্রন্থ।

প্রায় ছয় শতাধিক পদ রচনা করেন লালশশী। তম্মধ্যে সাধন বিষয়ক সমুদয় পদগুলি সন্ধ্যাভাষায়। সাধন বিষয়ক পদগুলি হল খেপার সাট, আদাড়ের সাট, রসিকের সাট, মানুষের সাট, সহজের সাট ইত্যাদি। আর কিছু সংখ্যক পদ হল শ্রীকৃষ্ণ লীলা, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা, পৌরাণিক দেবদেবী, শ্রীগুরুর অনুধ্যান ইত্যাদি। এই পদগুলি সহজ বাংলা ভাষায় রচিত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে সহজ বোধ্য বলে পরিগণিত হতে পারে।

পদগুলি এক একটি ভাবধারার উপর রচিত হওয়ায় সেই ভাবধারার সমষ্টিগত পদগুলিকে সাট বলে। সাধন বিষয়ক পদগুলি ও লীলাপ্রসঙ্গ পদগুলি গুরু শিষ্য সংলাপের ভঙ্গিতে সন্ধ্যাভাষায় ও বাংলা ভাষায় রচিত। উভয় ভাষারই প্রয়োগ ভাবের গীতে বিদ্যমান রয়েছে।

ভাবের গীত হল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভক্তগণের নিকট অতি পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ ও সাধন জীবনে উন্নত হওয়ার প্রেরণা স্বরূপ দিগ্‌দর্শন। এ সম্প্রদায়ী ভক্তগণ অতি নিষ্ঠা, ভক্তি ও পবিত্রতার সহিত এই গ্রন্থ প্রতি শুক্রবারে সঙ্গীতের সুরে কীর্তন করেন। ভক্তবৃন্দ কর্তৃক আহুনায়িত ভগবৎ মজলিসেও কীর্তন করা হয়। কীর্তন অন্তে মহাশয় পদের অন্তর্গত মর্মার্থ ভক্তদের নিকট বিশ্লেষণ করে তাঁদের সাধন জীবনে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা দান করেন।

প্রথমে ভাবের গীতের মাত্র কয়েকটি পদ খাতায় লিখে নিয়ে ভক্তগণ শুক্রবারে কীর্তন করতেন। সমুদয় পদগুলি তাঁদের অজানা থাকায় ব্যথিত হয়ে ভক্ত রমেশ চন্দ্র দাস ঘোষ পদগুলির সমষ্টিগত ভাবের গীত মুদ্রিত করে প্রথম প্রকাশ করেন ১২৮৯ সালে।

এরপর প্রকাশ করেন মনুলাল মিশ্র ১৩১৩ সালে। পরিশেষে ডাক্তার ভুবন মোহন গাঙ্গুলি প্রকাশ করেন ১৩১৯ সালে। পুনঃ মুদ্রণের ফলে মনুলাল মিশ্র কর্তৃক প্রকাশিত ভাবের গীত প্রচলিত রয়েছে কিন্তু অপর দুই ভক্তের প্রকাশিত ভাবের গীত পুনঃ মুদ্রণের অভাবে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবার পথে।

ভাবের গীতে সাধন বিষয়ক পদগুলি সন্ধ্যাভাষায় রচিত হওয়ায় ইহার অন্তর্নিহিত ভাবধারা অনুধাবণ করা সম্ভবপর না হওয়ার জন্যই বোধ হয় এখনও পর্য্যন্ত সুধীসমাজ ভাবের গীত তত্ত্ব গ্রন্থটিকে সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করতে কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন বলে ধারণা হতে পারে।

লালশশী ভাবের গীতে বললেন ঃ

ভাবের গীতের ভাবুক যে সেই ভাব
বুঝিতে পারে, ক্রমাগত রত অসাধারে
সাধক বলি তারে, যে সহজ কথা বুঝে
না তারে বলবো কি, ইচ্ছা করে মুখ
লুকায়ে চুপ করে থাকি, দ্বৈতবাদী যে,
সে কি তা বুঝে, যে কথার নির্ধার
আছে হৃদি সরোজে, এখন ভাব বিনা
কোনখানে ভাবের হবে বল ভাব জানা।

সঙ্গীতমালা

(১)

এবার জগতমাতা সতীমা বিনে, ভব পারের
উপায় আর দেখিনে। একবার বদন তুলে, চাও মা
নেত্র মিলে, ডাকে দীনের অধীন এই সন্তানে।

আমি বোলবো কিগো আর, জন্মে যে গো নিঃস্বম্বলে
তারে কর পার, হলাম অর্থ বিহীন, অতি দীনের
অধীন, তোমার ভজন সাধন জানিনে।

দিলে সতীমায়ের জয়, আপদ খণ্ডে বিপদ খণ্ডে
খণ্ডে কালের ভয়, দিলে মায়ের দোহাই, ঘোচে আপদ
বালাই, ছুঁতে পারে না কাল শমনে।

মায়ের নামের গুণ শুনি, দয়াময়ী দুঃখ হরা জগৎ
জননী, ভেবে কুবীর বলে, আমার অন্তিম কালে,
যেন স্থান মেলে রাঙ্গা চরণে।

(২)

এবার দুলালচাঁদ হয়েছেন কাণ্ডারী, আর কি ভবপারের
ভয় করি, আমার দয়াময় দুলাল, সত্য নামের তরিতে
ধরেছেন কেরুয়াল, চায়না অর্থ পুঁজি, তিনি এমনি
মাঝি, বল তোরা দুলাল নাম বদন ভরি।

আমার দুলালের কৃপায়, অন্ধ আতুর বোবা কালা
সবাই তরে যায়, খেলে নাম ঔষধি, যায় অসাধ্য
ব্যাধি, দুলালের মহিমার বলিহারি।

দুলাল নামের মহিমে, কোলের শিশু বনের পশু
বন্দি হয় প্রেমে, যত শৈব শাক্ত, হয়ে প্রেমে মত্ত,
করে নৃত্য যত সব পুরুষ নারী।

বলে কুবীরচাঁদ গোঁসাই, ঘোষপাড়াতে মানুষ লীলে
বলিহারী যাই, হয়ে শিশু ছেলে, করে মানুষ
লীলে, যাদুবিন্দু দেখ নয়ন ভরি।

(৩)

গুরু পদেতে মজ মূঢ় মন
সদা ঐ চরণ, কর রে স্মরণ,
চরণ ভাবিলে ভাবনা যাবে, পার হবি ভব জীবন।
আনন্দময় স্ব-চৈতন্য যাঁর কৃপায় জীবের চৈতন্য
সমভাবে সমাশ্রয়ে সমাশ্রয় পূর্ণ
তিনি অনাদি সকলের আদি
ঐ যে গুণাতীত, গুণান্বিত স্বগুণে গুণ ধারণ।
পরমে পরম দেবতা গুরু হন সকলের আত্মা,
গুরুতে সব দেব সংস্থিতা
তিনি নিরাভাস আছেন তত্ত্বাভাস
তিনি এই স্বরূপে নিত্যরূপে, করিতেছেন কাল যাপন।
আদি ক্ষেত্র ব্রহ্ম-ভূমি যে ভাবে সে অন্তর্য্যামী,
আশা ত্যাগী বিধি নিষ্কামী,
হলে পাবে তায়, হাউড়ে ইহাই কয়,
কেন অচিন্তা চিন্তাতে সদা, মগ্ন থাক অনুক্ষণ।

(৪)

যা কর নিজ গুণে, মানুষ চাঁদ মানুষ দয়াময়,
যেমন গুটি-পোকা গুটি করে, আপন বন্ধনে পড়ে,
আপনি মরে, আপন ঘরে, তদ্রুপ প্রায় বন্দি হলাম,
কাটতে নারি প্রাণ যায়।

আমি ভব ঘোরে বন্দি হয়ে, কাতরে ডাকিহে তোমায়,
কোথা আছ দীন দয়াময়, বিপদে দাও দেখা আমায়,
আমার বিপদে সম্পদে তুমি, তোমা বই কে আছে আমার,
যদি হই অপরাধি, তথাপি তুমি গতি, শুন হে প্রাণপতি,
মিনতি আমার, আমার অপরাধ মার্জনা কর, শরণ
নিলাম রাঙ্গা পায়।

আমায় একলা পেয়ে মায়া জালে, বন্দি করলে ছয় জনায়,
আগে জানতাম যদি ভবে এসে, ভবেতে এ সব যন্ত্রণা,
কলুদভবে না আসিতাম, করিতাম তোমার ভজনা,
তুমি হে কৃপা করি, কেটে দাও মায়াদড়ি,
ঘুচে যাক মনের বেড়ি এ সব যন্ত্রণায়।

আমরা দুই জনাতে, ঘর বাঁধিলাম, সুখেতে
থাকবো এই ঘরে, পরের মন্ত্রণা পেয়ে,
আমাকে ফাঁকি দিয়ে, এখন আর রয়না ঘরে,
রইলো বাহিরে, তোমার অতুল চরণ রয় যেন মন,
কাতরে জ্ঞান দাসে কয়।

(৫)

(বাদি মন) কোন সাধনে যাবি। আমি দিবানিশি
বসে ভাবি, ব্রহ্মা বিষ্ণু গুণান্বিত, পেয়ে মায়া মহামৃত,
সে সব শুনি নিদ্রাগত, চৈতন্য রহিত, সে যে শব্দ গন্ধ
কলে, কামেরি শিকলে স্থানে স্থানে আঁটা উল্টা চাবি।

শচীসুত বল যারে, ত্রিবেণীর ঢেউ লাগলো তারে, সেই
জোয়ারে ভেসে এসে ফিরচে দ্বারে দ্বারে, সে যে ত্রিবেণী
ভাসে, সুখে শ্রীনিবাসে, নন্দের ঘরে এসে চরায় গাভি।

ত্রিবেণীর ঐ বাঁধা ঘাটে, দুয়ার আঁটা তিনটি কাঠে,
ভাব জলুই আঁটা তাতে, রূপ রসের কপাটে, তাতে কত
মহাজন, কাণ্ডারী বিহন, বাওড়ায় পড়ে তারা খাচ্ছে খাবি।

দুইদিকে তার বিষের নদী, বইছে ধারা নিরবধি, সঙ্গেতে
অমৃত নদী, চিন্তে পার যদি, খেপা মদন চাঁদে কয়, তার
মাঝে ডুবলে হয়, নইলে বিষ খেয়ে প্রাণ হারাবি।

(৬)

ভবেতে এলাম একা, জুটলো দোকা, ভেকা হলাম সেই রসেতে,
মায়াতে মাথা চোখা, লাগলো ধোঁকা, গুটি পোকার বন্দি মতে।

এলে ঐ পূর্বভাবে ভবার্ণবে মনভ্রমে ভ্রমি তাতে,
আমার এই সুখের ভরা, জল ভরা, নাই কিনারা ভাবছি তাতে।

পুষে ঐ কাল নাগিনী, দিন রজনী ঘর করতেছি পরের সাথে,
সদা দেয় দেহ গঞ্জনা, কি যন্ত্রণা, কু-মন্ত্রণা বিধিমতে।

বসে কেউ নিচ্ছে মজা, পাচ্ছে সাজা, বইছে বোঝা পাঁচ ভুতেতে,
হাউরে কয় প্রাণে-কষ্ট, কি অদৃষ্ট, জীবন নষ্ট ঘোর ফেরেতে।

(৭)

যথা গরল তথা সুধা দুয়েতে এক পাত্রে রয়, গরল
রেখে অন্তান্তরে সুধা খেতে পারে হয়।
সুধা গরল এক পাত্তরে, জানিয়ে যে সাধন করে, গরল রেখে
অন্তান্তরে সুধা যে জন খায়, যে সুধা সেই অমৃত,
সাধকেতে করে বর্ত, পাইয়ে পদ্মমভয়, নিরাপক্ষে বলে রয়।

শুনেছি এক কালনাগিনী, তার কাছেতে বিষের খনি, যথা
ফণী তথা মণি সাধু শাস্ত্রে কয়, আত্ম তত্ত্ব নাহি সেরে,
ধর্তে যায় সেই অজাগরে, মাণিক পাবার আশা করে,
উল্টে ছোঁ মারে তার গায়।

মৃগ সিংহ এই দুই জনে, বসে আছে একাসনে, হিংসা
নাহি কারু মনে, সাধক তত্ত্বপায়, আনন্দমোহিনী বলে,
পূর্ণ যেজন সাধক হলে, ফণীর মণি নেয় গো তুলে,
মদন ফকির ইহাই কয়।

(৮)

গুরু থাকেন সহস্রারে,—ষট-চক্র উপরে,
রক্ত শক্তি সঙ্গে তিনি, আনন্দে সদা বিহরে।

সাধনাদি উর্দ্ধশ্বাসে, উর্দ্ধ নেত্রে অভ্যাসে,
শুদ্ধ সচেতনে বসে, ব্রহ্ম-রূপ থাক নেহারে।

বামে ইড়া নাড়ীর খেলা দেখ অন্তরে,
পুরকেতে প্রাণ-বায়ু তাতে সঞ্চারে,
সুষুম্না সাধকেরই সার, আধার-পদ্মে ধর সোধার,
কুণ্ডলিনী চেতনের পার, নাদ-বিন্দু ভেদ করে।

যেতে হবে নির্মল পথে হয়ে নির্বিকার,
বিম্ব-ভেদী হলে পরে দেখবি ব্রহ্মাগার,
সেই আগারে থাকবি সদা, আনন্দ উন্মাদী বাঁধা,
তবে ঘুচবে ভব ক্ষুধা, গেলে পর ব্রহ্মাণ্ড পারে।

পার হলে পার হবি তবে শুন আমার মন,
এ পার থেকে ও পার দেখবি করিয়ে সাধন,
হাউরে বলে যোগেশ্বরী, জাগলে যাবি আনন্দপুরী,
পরম শিবে লয় ঐ করি, পরমাত্মার আত্মা হয়ে।

(৯)

সহজ মানুষ আলেকলতা, আলেকে বিরাজ করে, বাইরে খুজলে পাবি কোথা, আলেকের প্রেমের কলে, পেতেছে বাঁকা নলে, আপনি জল উজান চলে, বহিছে সর্বদা। সে আপনি চলে নালের পথে, সে নালকে কে পারে চিন্তে, জগতে করে চিন্তে, চিন্তামণি চিন্তে দাতা। আলেকের প্রেমের রসে, সোনাতন সদাই ভাসে, বাউলে তোর লাগলো দিশে, যেতে নারবি সেথা। সদাই বেড়াও রিপুর বশে, আপন মনের মানুষ চিনবি কিসে, যে দিনে ধরবে এসে মুগুরেতে দিচ্ছে মাথা।

(১০)

শ্রীরূপ নদীটী অতি চমৎকার। তোরে বলি সার, হৃদে কর বিচার, দেখে ভব-গর্ত্ত, হলি মত্ত, আস্বাদন কি বুঝলি তার॥ বিষম সে ত্রিপানি নদী, ত্রিকোণ যন্ত্র পাতাল ভেদি, মধ্যে আছে মহা ঔষধি। ওঠে ঘুরনো জল, ধর গুরু বল, খুল্লে মণি-কোটা, বাদে ঠ্যালা, সেখানে খুব খবরদার॥ নদীর ভিতর তলায়, গরল সুধা, এক পাত্রেতে বহে সদা, সুধা খেলে যায় ভবক্ষুধা। গরল পান কোরে, প্রাণেতে মরে, ছুটে সেই উল্ট-কল, নেবেছে ঢল, শিখতে হবে আগুসার॥ ত্রিপানিতে তিনটী ধারা, নিধরাতে আছে ধরা, ঠিক রেখ তুই নয়নের তারা। পলকে প্রলয়, হয়ে যাবি ক্ষয়, নইলে স্থূলে মূলে, সকল ভুলে, কোর্ত্তে হবে হাহাকার॥ বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে, যেতে হবে নিষ্কপটে, সাধু বাক্য ধরয়ে এঁটে। তিন দিন বারুণী, তাইতে স্নান শুনি, নাহলে মহাযোগে, অনুরাগে কাম কুম্ভির কি কোরবে তার॥

রসিক ডুবুরি হলে, ডুব দিয়ে সেই গভীর জলে, অনায়াসে রত্নধন তোলে। গোঁসাই গোবিন কয়, কুবির চাঁদের জয়, ভেবে গোপাল মুর্খ, পায়রে দুঃখ, দিনে দেখে অন্ধকার ॥

(১১)

আপন মনের মানুষ মনে রেখ যতনে, দিয়ে দর্পণে পারা, ঠিক রেখ দুই নয়ন তারা, প্রেম রসে অঞ্জন করা, আপনি লাগবে নয়নে ॥ মনের মানুষ মন ছাড়া কেউ কোরনা, কলেবরে ষোলআনা, হিসাবের ঘরেতে উসুল ভুলনা, বোম্বেটে বসে আছে ছয় জনা। প্রাণধন গেলে পরে, ভাসবি অকুল পাথারে, সাথি সব যাবে ছেড়ে, কাঁদতে হবে নির্জ্জনে ॥ দেখ খুঁট ধরে বসে আছে যে জনা, জাঁতার ঘা লাগে না গায়, কত তুফান কেটে যায়, তেমনি ধারা হলে হয় তার সাধনা, অনুভাবে বুঝিলাম উপাসনা। যেমন চুণে হলুদ দিলে পরে, দুই রংয়ে যায় আপনি সরে, শেষ কালেতে লাল রং ধরে, ঠাউরে দেখ চেতনে ॥ গুরু বর্ত্ত করে মত্ত হলো যে জনা, গুরু শিষ্য একুই আত্মা, যার হয়েছে পরমাত্মা, বর্ত্তমান কোরেছে কর্ত্তা সৃজনে। গোঁসাই কানাই লাল কয় গেল বেলা, ভাংলরে আসুখের খেলা, ভাব সাগরে দাওগে ভেলা, কাজ কি অন্য সন্ধানে ॥

(১২)

সাধ করে, ডুবালাম তরি ত্রিবেণীর খালে, পড়ে ভাটার মুখে উল্টাপাকে, হাল ঠেকে না জলে। মধ্যে চড়া বিষম খাঁড়ি, (তাতে) বাঁকা স্রোত কুবলোভারী, কু-বাতাসে দিতে নারি পাড়ী, করে উদ্ধো পোঙ্গা,

সাধের ডিঙ্গা, মাল ঝেড়ে যে ফেলে। আপনি মরি
পরকে সারি ঝিঁকে না যোগায়, দাড়ী বয়ে ঘাম
চুয়ায়, মরি হায়, যখন যায় হাল কাছী কেটে,
শুধুই হাতে বাই গো বটে, চৌদ্দ পোয়া এক কেটে,
কাৎ হয়ে যায় চলে। যে পর্য্যন্ত পারি হালের
ঘায়ে বেয়ে যাই, নইলে ঝাঁপ দিয়ে পলাই,
মরি হায়, ভাঁড়ায় দহের মধ্যে পড়ে, রাস্তা ভুলে
মরি ঘুরে, বেগ ছেড়ে শোকে ধরে, চিন্তা চাপানলে।
ধনে প্রাণে এবার আমি যদি রক্ষা পাই, তবে ঠেকে
শিখে যাই, মরি হায়, আত্মা পরম-হংসে বলে,
হাউরে পড়ে সন্দী কলে, বন্দী হলো পথ ভুলে, থেকে
কুহক জালে।

(১৩)

ধরবি যদি অধর মানুষ ধরাকে ধররে মন। মনোফুলে,
নয়ন জলে, পূজগে মানুষের শ্রীচরণ। ধরার কাছে
আছে ধরা, সেই মানুষটি জ্যান্তে মরা, মরার সঙ্গে
হয়ে মরা, খোঁজে যেবা জন। হিংসা নিন্দা
তমো যাবে, তবে দেহ শুদ্ধ হবে, তবে সে ফল হাতে
পাবে, অধর ধরার এই লক্ষণ। আপন দিল
দোরিয়ায় বোঝ, বুঝে ভাব প্রেম রসে মজ,
তবে হবে ধরার খোঁজ, হবে উদ্দীপণ। চৈতন্যকে
রেখে খাড়া, হুসার হয়ে দাও পাহারা, ঠিক রেখ
দুই নয়ন তারা, সহজ ভাবে কয় মদন। কাম, ক্রোধ,
লোভ, মোহ, মদন, মাৎসর্য্য সহ, এদের সকল ধরে
দেহে, থাক সচেতন। শুদ্ধভাবে নিষ্ঠা হয়ে, থাকরে
মন চাতক হয়ে, নবঘন বারি পেলে, দিবে
সে তোরে তখন।

(১৪)

মনের মানুষ আছে যে দেশে, আমি যাব সেই দেশে,
মানুষ সপ্ত সাগর পারে আছে গো, গুরু বল্লেন আমায়
আভাযে। ও সে রাস্তা ভয়ঙ্কর, আছে
নদ নদী বিস্তর, পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিনজনা
তস্কর, আমি মন্ত্র বলে ছল কৌশলে (হায় গো)
তাদের রাখিব আপ্ত বশে। মানুষ যে ঘরেতে রয়,
তার হাজার দুয়ার হয়, দ্বারের দ্বারি সারি সারি
আছে পাহারায়, আমি অটল হয়ে সুটল মানুষ
(হায় গো) তারে বাঁধিব ভক্তি পাশে। যদি সাধন
কর মন, তবে পাবি সে রতন, নইলে হারাবি
লাভে মূলে পূর্ব ধন, প্রতাপ বলে আমি রইলাম
বসে গোঁসাইয়ের চরণ আশে।

(১৫)

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল, সহজ জানাবার তরে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
নান্নুর গ্রামেতে, প্রবেশ যাইয়া করে। বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া,
চণ্ডীদাসে কিছু কয়। সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু
নয়। ছাড়ি জপ তপ, করহ আরোপ, একতা করিয়া মনে। যাহা
কহি আমি, তাহা শোন তুমি, শুনহ চৌষট্টি সনে। বস্তুতে গৃহেতে,
করিয়া একত্রে, ভজহ তাহারে নীতি। বাণের সহিতে, সদাই যজিতে,
সহজের এই রীতি। দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে, যাইলে
প্রমাদ হবে। এই কথা মনে, ভাব রাত্রদিনে, আনন্দে থাকিবে
তবে। রতি পরকীয়া, যাহারে কহিয়া, সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারি, রামিনী নাম যাহার।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, শুনহ দ্বিজের সুত। এ কথা
লবে না, না জানে যে জনা, সেই সে কলির ভূত।

(১৬)

কাতরা অধিকা, দেখিয়া রাধিকা, বিশাখা কহিল তায়। চিতে এত ধনি, ব্যাকুল হইল, ধরম সরম যার ॥ কাতরা হইলে, জীবন যাইবে, ধনি কহব তোমার ঠাক্রী। পরকীয়া রস, করিতে হে বশ, অধিক চাতুরী চাক্রী ॥ যাইবি দক্ষিণে, থাকিবি পশ্চিমে, বসিবি পূরব মুখে। গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি, থাকিবি মনের সুখে ॥ গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি, সাধিবি মনের কাজ। সাপের মুখেতে, ভেকেরে নাচাবি, তবেত রসিক রাজ ॥ যে জন চতুর। সমেরু শিখর, সুতায় গাঁথিতে পারে। মাকসার-জালে, মাতঙ্গ বাঁধিলে, এ রস মিলয়ে তারে ॥ পিরীতি যার সনে, আদর সে ধনে, সতত না লবি ঘর। অন্তরে পরাণ, বাঁটিয়া দেওবি, বাহিরে বাসিবি পর ॥ বেদ বেদান্তের, না করিবি বিচার, না লৈবি বেদেরি রস। হইবি সতী, না হবি অসতী, না হবি কাহার বশ ॥ হইবি কুলটা, কুল তেয়াগিবি, ভাবিতে ভাবিতে দেহা। হেরি পর পতি, হেমকান্তি রতি, স্বপতি ভাবিধি লেহা ॥ কলঙ্ক সাগরে, সিনান করিবি, এলাইয়া মাথার কেশ। নীরে না ভিজিবি, জল না ছুইবি, সম দুঃখ সুখ ক্লেশ ॥ কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে, বাশুলী চরণে পড়ী। হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাঁটিবি, নাহিক ছুঁইবি হাঁড়ি ॥

(১৭)

প্রেমের আকৃতি, দেখিয়ে মূরতি, মন যদি তাতে ধায়। তবে ত সে জন, রসিক কেমন, বুঝিতে বিষম তায়। আপন মাধুরী, দেখিতে না পাই, সদাই অন্তর জলে। আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি, কি হৈল কি হৈল বলে। মানুষ অভাবে, মন মরিচিয়া, তরাসে আছাড় খায়। আছাড় খাইয়া, করে ছট্‌ফট্‌, জিয়স্তে মরিয়া যায়। তাহার-মরণ, জানে কোন জন, কেমন

মরণ সেই। যে জনা জানয়ে, সেই সে জীবয়ে, মরণ বাঁটিয়া লই। বাঁটিলে মরণ, জীবে দুই জন, লোকে তাহা নাহি জানে। প্রেমের আকৃতি, করে ছট্‌ফটি' চণ্ডীদাসে ইহা ভণে।

(১৮)

স্বরূপ বিহনে, রূপের জনম, কখন নাহিক হয়। অনুগত বিনে, কার্য্য সিদ্ধি কে মনে সাধকে কয়। কেবা অনুগত, কাহার সহিত, জানিবে কেমনে শুনে। মনে অনুগত, মঞ্জরী সহিত, ভাবিয়া দেখহ মনে। দুই চারি করি, আটটী আখর, তিনের জনম তায়। এগার আখরে, মূল বস্তু জানিলে, একটি আখর হয়। চণ্ডীদাসে কহে, শুন মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ ভাই। সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।

(১৯)

তুমি সেই রতন, তোমায় হেরে ভুললো নয়ন মন,
এলাম কুল শীল তেজ্য করে গো
তোমায় না হেরে মন করে কেমন।
তুমি আপনি মজে মজালে,
প্রেম পাথারে ভাসালে, বাকি কি আর রাখিলে,
কর হৃদয় মাঝে প্রেমের উদয় গো,
কানায় শিখালে ভাবের করণ।
তুমি কল্লে যে নিত্য লীলে,
ভাবির ভাব প্রকাশিলে, এসে ভাবে ডুবালে,
তুমি স্বরূপে রূপ মিশাইলে গো
আমায় শিখালে ভজন সাধন।

তুমি দয়াল সেই সতীর পতি,
হও হে অগতির গতি, তোমার মর্ম্মের বসতি,
তোমা ধনে যে জন জানে গো,
তারে কোরে নাও আপন বরণ।
দয়াল তোমা বিনা আমার কেবা আছে,
যাব বল কার কাছে, তোমায় দেখলে প্রাণ বাঁচে,
যেন বঞ্চনা কোর না আমায় গো,
তুমি চাতকিনীর প্রাণ-ধন।
এবার ভেবে জ্ঞানদাসে বলে,
নিস্‌তেলে বাতি জলে, তোমার দয়া হইলে,
তুমি ইহাই কর ও দীন দয়াল গো,
যেন ভুলিনে অভয় চরণ।

(২০)

ওহে মানুষ তোমায় আমি,
চিন্তে কি পারি,
তুমি ভবার্ণবের কাণ্ডারী।
অসীম মহিমা তোমার,
বুঝতে সাধ্য নাহি আমার,
কাঙ্গালে করিতে নিস্তার,
হও হে কাঙ্গাল বেশধারী।
চিন্তে যদি পারিতাম,
তবে কি তোমায় ভুলিতাম,
হৃদয়ে তোমায় রাখিতাম,
করিয়ে হৃদয় বিহারী।
মিত্র বলে যে তোমারে,
চিনায়ে দেবে আমারে,

তার মত আর এ সংসারে,
কে আছে উপকারী।

(২১)

বাইশ ফকিরের মাঝে,
ও কে কাঙ্গাল বিরাজে,
কাঙ্গালে করিতে কৃপা,
কাঙ্গাল সাজ সাজে।
তাল আঁটির হুকা করে,
খড়ি উরে কলেবরে,
ভক্তি পেলে উল্লাস করে,
ফিরিছে ভক্তেরি কাজে।
সোনার বরণ কলেবর,
রূপে গুণে মনোহর,
কোটি কোটি শশধর,
রূপ হেরিয়ে মরে লাজে।
ভক্ত বৎসল দয়াময়,
এমন কি আর কেহ হয়,
ভক্তে যদি বেদনা পায়,
সে বেদনা তারে বাজে।
দীন হীন মিত্র কয়,
কি দয়া তা কবার নয়,
জীবের প্রতি হয়ে সদয়,
এসেছে ঘোষপাড়ার মাঝে।

(২২)

মানুষ সদা আনন্দময়, রসে ভরা পূর্ণচাঁদ উদয়,
তাঁর ভাবেতে যে ডুবেছে, দূরে গেছে ভবভয়।
সদা নিত্য সুখে রয়, মানুষ সদা আনন্দময়,
করিলে তাহারি সঙ্গ, হৃদয়ে তরঙ্গ বাড়ায়,
সদানন্দে প্রেম তরঙ্গে, ভক্তের সঙ্গে কথা কয়।

সদা ভাবেতে ভরা, যুগল নয়নে ধারা,
পূর্ণিমার চাঁদ বেষ্টিত, ভক্তগণ তারা,
কিবা মধুর হাসি, সুধারসে ভাসি,
রবী শশীর যেন, মিলন তায়।

সদা মহানন্দেতে, ফেরে ভক্তের সঙ্গেতে,
ভক্তের ভাবে ভুক্ত হয়ে, বর্ত্তমান আছে,
প্রেমাবৃত অনাবৃত, সে ফল ভক্ত কোকিলে খায়।

সে মানুষ বেদ বিধি পারে, এসেছে জীবেরি তরে,
দেবের দুর্ল্লভ প্রেম রতন, দিচ্ছে সবারে,
গোঁসাই কমল বলে সরল হলে,
তাতেই মানুষ ভুক্ত রয়।